KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : 82 বিধান পল্লী, যাদবপুর, কল-৩২ (21) সি/2 আর-২৪৬-ই ৩০ই রামকৃষ্ণ সমাধি রোড, কল-৫৪
Collection : KLMLGK	Publisher : অরবিন্দ বসু
Title : অন্তরতম	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 18 19 20 21	Year of Publication : Sep 1983 May 1985 May 1986 Feb 1989
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : অরবিন্দ বসু	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

অজ্ঞাতবাস

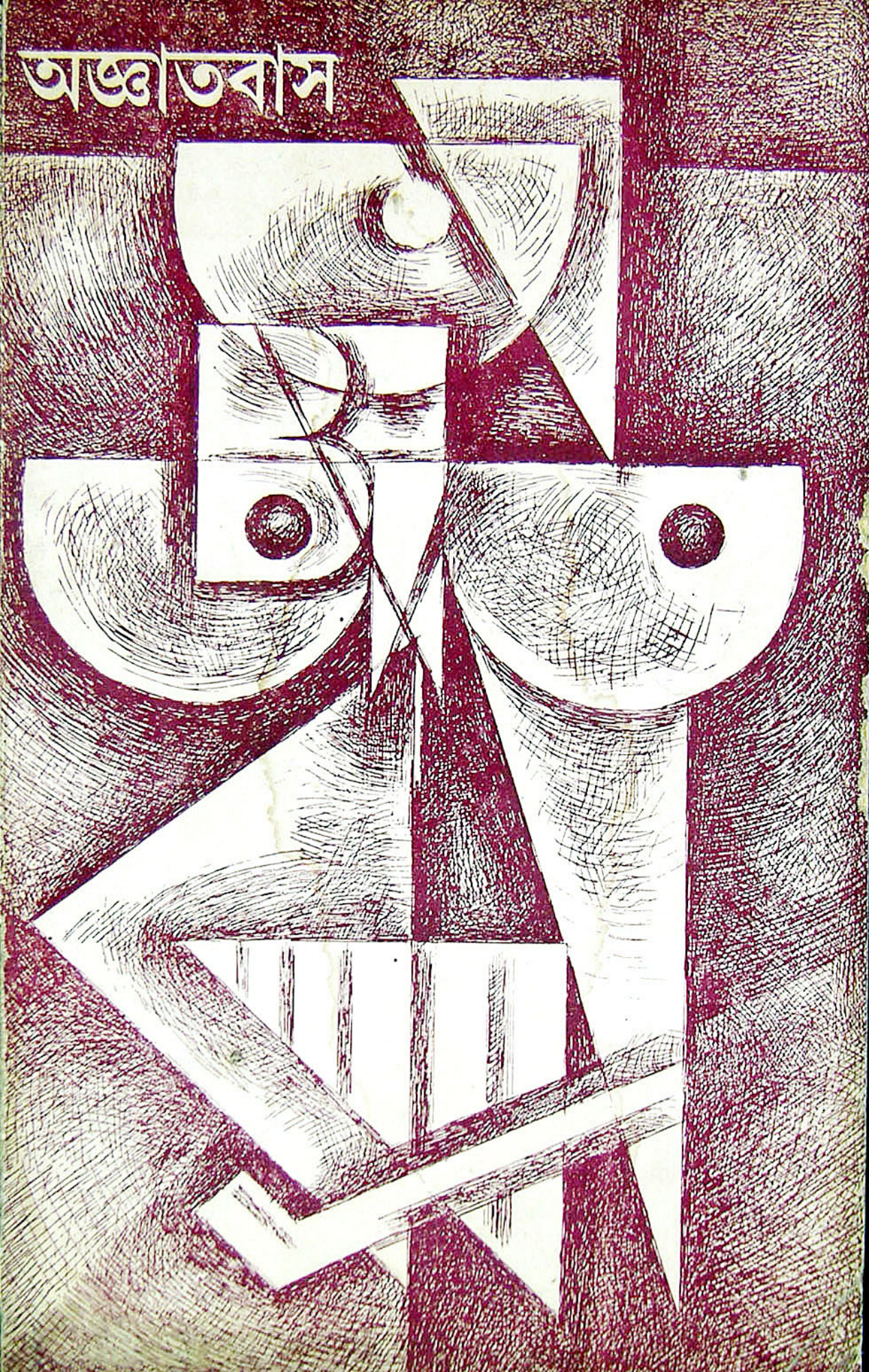

অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাতবাস অজ্ঞাতবাস অজ্ঞা
প্রথাবিরুদ্ধ কবিতা ও কবিতা বিষয়ক গদ্য-পদ্যের কাগজ প্রথা-
বিরুদ্ধ কবিতা বিষয়ক প্রথাবিরুদ্ধ কবিতা ও কবিতা বিষয়ক
অজ্ঞাতবাস সংকলন ২১ বইমেলা ১৯৮৯ বইমেলা অজ্ঞাতবাস

সূচি অজ্ঞাতবাস সংকলন ২১ বইমেলা ১৯৮৯

কবিতা : নিত্য মালাকার কালীকৃষ্ণ গুহ অরুণ বসু আলোচনা :
মণীন্দ্র গুপ্ত কবিতা : সঞ্জীব প্রামাণিক শেখর মৈত্র গৌতম হেঁস
সুব্রত সরকার প্রভাত সাহা প্রদীপ সাহা সুব্রত পাল ইন্দু বর্মণ
সোমেন ভট্টাচার্য অনুভব সরকার সন্তোষ সিংহ সুব্রত রায় চিরঞ্জীব
সরকার অরুণ সাধুখাঁ জহর সেন মজুমদার ফল্গু বসু অশোককুমার
গুপ্ত নির্মল হালদার রণজিৎ দাশ অরুণেশ ঘোষ পার্থপ্রিয় বসু
দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় চিঠি : প্রিতম মুখোপাধ্যায় চিঠি প্রসঙ্গে :
প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘ কবিতা : দেবদাস আচার্য ক্রোড়পত্র ১.
অষ্টক কবিতা গ্রন্থ পরিমার্জিত পুনর্মুদ্রণ সুকুমার ঘোষ প্রচ্ছদ :
তপন বন্দ্যোপাধ্যায় অজ্ঞাতবাসের পক্ষে প্রকাশক অরুণ বসু
ফ্ল্যাট—সি/২ আর-এইচ-ই ৩০ই রামকৃষ্ণ সমাধি রোড কল-৫৪
মুদ্রণে : অমি প্রেস ৭৪ পটলডাঙ্গা স্ট্রিট ক'ল-৯ দাম : চার টাকা

২১ সংখ্যক অজ্ঞাতবাস প্রসঙ্গে

লাজুক স্বভাবের, সম্পূর্ণ আত্ম-প্রচারবিমুখ শ্রদ্ধেয় সুকুমার ঘোষ বর্তমান সংকলনের উল্লেখযোগ্য সংযোজন। বিদেশি সাহিত্যের পাশাপাশি ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ ও প্রাচীন ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী, নির্লিপ্ত এই লেখকের বর্তমান ঠিকানা : ফ্ল্যাট—৪৯৬, ব্লক—এ এফ্, সল্টলেক সিটি, ক'লকাতা-৬৪।

একদা প্রকাশিত তাঁর প্রথম একক কবিতা গ্রন্থ "অষ্টক"। প্রকাশিত হয় সেই ১৯৬১-তে। প্রায় ২৭/২৮ বছর আগে—স্বপ্নের মতো আমাদের দুরন্ত ছাত্রাবস্থায়। অলৌলিক আটটি দীর্ঘ কবিতার সমবায়ে রচিত এই ধ্রুপদী-গ্রন্থটি বর্তমান প্রজন্মের লেখকদের প্রায় সমবয়সী এবং চিরকালীন।

২৭ বছর পরে, অনেক দেরিতে হ'লেও, এর পুনর্মুদ্রণ অত্যন্ত জরুরী হ'য়ে পড়েছিলো আমাদের কাছে। একে উদ্ধার ক'রে পুনর্মূল্যায়ণের দায়িত্ব পালন করতে পারার মধ্যে দিয়ে ভাবা যেতে পারে, অন্তত একটি আধিভৌতিক 'উল্লাস' আমরা বাংলা কবিতার সচেতন-পাঠকদের উপহার দিলাম।

এ-ছাড়া, আরো একটি উজ্জ্বল-উপহার দেবদাস আচার্যর 'উৎস-বীজের গান'। অসাধারণ এর 'প্রথম আবর্ত' আমরা প্রকাশ করতে পেরে গর্ব অনুভব করছি। এরকম আরো ৩/৪টি আবর্ত লেখা হ'তে পারে ব'লে দেবদাস আমাদের জানিয়েছেন। এই পদ্যটি দেবদাসের সামগ্রিক মৌলিক-রচনা-ক্রমের অপর একটি ভিন্ন ধারার সূচনা-সঙ্কেত।

আমরা বিশ্বাস করি, যে-কোনো বিতর্কই বিষয়-কে সমৃদ্ধ করে। এবং এও বিশ্বাস করি, সুস্থ বিতর্কে ব্যক্তি-আক্রমণের কোনো জায়গা নেই। সন্দেহ নেই, প্রসূনের গদ্যটি আপাতভাবে খুবই আক্রমণাত্মক। তবু, আমি এর বিষয়গত তাৎপর্যের কথা ভেবেই লেখাটি হুবহু ছেপে দিলাম। যদিও, প্রসূন স্বীকার করেছেন, তাঁর আক্রমণের মূল সূচিমুখ প্রিতম নন। তা সত্ত্বেও লেখাটি প্রিতমকে আহত করবে, সন্দেহ নেই।

সে যাই হোক, প্রিতম এবং পাঠকদের প্রতি আমার অনুরোধ, তাঁরা যেন আক্রমণকে নয়, বিতর্কিত মূল বিষয়টিকেই গ্রাহ্য করেন।

এ-প্রসঙ্গে আরো একটি কথা মনে রাখা জরুরী, সূচিত এই বিতর্কের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রতিষ্ঠান ও তার সামগ্রিক চরিত্রটিকে সঠিকভাবে বুঝে নিতে চাইছি এই কারণে যে, পরবর্তী লড়াইয়ের জায়গা থেকে যেন আমাদের কখনো পিছু হটতে না-হয়।

সব শেষে, সবিনয়ে জানাই, ছোট কাগজের সম্পাদনার কাজ অত্যন্ত জটিল ও দুরূহ। যথেষ্ট সাহস ও যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। এ-দুটোর কোনো একটিরও আমি অধিকারী নই। বরং, এ-ভাবে ভাবা যেতে পারে, এই ক্ষুদ্র কাগজটির নিতান্তই খুব শাদামাটা একজন সামান্য প্রকাশক মাত্র আমি :—যদিও জানিনা, পরবর্তী অজ্ঞাতবাস আবার কবে প্রকাশিত হবে, বা আদৌ প্রকাশিত হবে কি না।

—অরুণ বসু

পুনশ্চ। বলা বাহুল্য, রণজিৎ দাশ তাঁর মূল্যবান কিছু সময় এবং শ্রম বর্তমান অজ্ঞাতবাসের সঙ্গে যুক্ত ক'রে ব্যক্তিগতভাবে আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। এই স্বীকারোক্তিটুকু না-থাকলে লেখাটির অসম্পূর্ণতা আমাকে পীড়িত করতো।

বাঁশীতে, শিকড়ে, মন্ত্রে আমাকে বাঁধিতে চায় যারা
ঝাঁপির গুমোটে রেখে মাঝে মাঝে ভাঙে বিষদাঁত
গলায় জড়াতে চায়, চুমু খায় সোহাগে গলিয়া,
তাদের জানায়ে দিয়ে। এসে গেছে পূর্ণিমার রাত।

ওদের বাঁশীর সাথে মুগ্ধ ফণা দোলায়েছি কত,
ক্লান্ত হয়ে কতবার বিষর খুঁজেছি নতমুখ,
কতবার বোবা রাগে গর্জে উঠে নিষ্ফল ছোবলে
মাটিতে ভেঙেছি মাথা—ওরা শুধু হেসেছে কৌতুকে।

মজ্জায় মজ্জায় আজ এ আমার কী নিবিড় ব্যথা,
স্পর্শাতুর পুচ্ছলতা, সারাদেহে যন্ত্রণার জ্বর,
নিষ্পলক দুই চোখ—দুই ফোঁটা হিংসার নির্যাস—
স্খলিত নির্মোক তনু—নবীন মসৃণ ভয়ঙ্কর।

খেলার নেশায় মেতে ওরা কি ভুলিয়া গেল হায়,
আমার বিষের থলি পূর্ণ আজ কানায় কানায়।

সরোজ দত্ত

নিত্য মালাকার

প্রাকৃত স্বপ্ন

এবড়ো খেবড়ো ঊষর মাটিতে ন্যাড়া, বৃদ্ধ তালসারি ; ত্যারা বাঁকা রেখায় জমির ঢেউ উঠছে নামছে।

আমরা শুধু দূর থেকে দেখি। পরে, ড্রইং রুমে দেয়ালে টাঙানো হয়। কোনো কোনোদিন ছটফট ক'রে ফ্রেম ভেঙে ছুটে পালাতে চায়। একদিন অসহায় সেইসব ছবি থেকে নেমে আসে কিছু উদোম মানুষ। এক বোবা খাঁদানাক কুচ্ছিত কালো ভগবানও নেমে আসে। সকলের হাতে তীরধনুক কিংবা উদ্যত বর্শা,—সূর্যশিকারের জন্য।

আমরা কিছু ফুলজল দিতে চাই, দিয়েছিও এতদিন—আমাদের শিক্ষা সংস্কার, ছাই, ধূম্রবুলি। ফুলে ওঠে নাক পাটা আর, ঠিকরে বেরিয়ে আসে ঈশানের লাল চোখ ; কী চায় সে ওরা ?

এবড়ো খেবড়ো ঊষর মাটিতে ন্যাড়া, বৃদ্ধ তালের সারি। ত্যারা বাঁকা রেখায় জমির ঢেউ উঠছে, নামছে।

অহল্যা

অহল্যা মানেই গ্রাম রোদেখোলাপিঠ। অহল্যা সবুজসুখ, প্রত্যন্ত পথের বাঁকে যেখানে সে নিহিতার্থ—সেখানেই, আমি তার নিজস্ব বিপ্লব।

বিপ্লব এগোতে চায়। স্বপ্ন, আমরা তার শেষ লক্ষ্য। পুঁথিপড়া বিহঙ্গম মনপড়া বিহঙ্গীকে ঝগড়ার সময়ই শুধু প্রশ্ন করে, কবে যে মানুষ একটু সিদ্ধার্থ হবে, বুদ্ধিমান।

ভাবি, ভাবি, ভাবি। অনেক প্রশ্ন উঠলে অহল্যা শীতার্ত নক্ষত্র হয়ে বদ্ধ জলাশয় থেকে লাফাতে লাফাতে আসে ডাঙায় আলের দিকে। যুদ্ধের ঘোড়াটা নেই, গাঙ ফড়িং তো আছে। অদ্ভুত বিনিময় অহল্যা জেনেছে। মরাই খলান মাঠ মৃত্যুবেদী কাকসভা পার হয়ে সে এখন এখানে আছে—জীবাশ্মের বর্তমান, ভবিষ্যৎ নেই।

অজ্ঞাতবাস

কালীকৃষ্ণ গুহ

জামগাছ

সেই জামগাছ সারাদিন দাঁড়িয়ে থেকেছে।
জামপাতা ছুঁয়ে দেখি পরিচয়হীন এক পৃথিবীর দিকে তারা যাওয়া ?
আমরা কোনদিকে যাবো ?

কালো পোশাকের মধ্যে অনুপম এগিয়ে এসেছে।
'অনুপম, আত্মপরিচয় দাও' ব'লে এই পৃথিবীর কিছুটা সংকেত আমি
গ্রহণ করেছি।

তারপর বাউল এসেছে—
তারা বাস্তবতা ভিক্ষুক-জীবন থেকে বাবলাগাছের সারি পার হয়ে
কেঁদুলির মাঠ, অন্ধকার

একে একে গ্রহণ করেছি।

আত্মপরিচয় থেকে দীর্ঘ নীরবতা। নির্জন গোধূলি। তার পাশে
সঙ্গীত ভবন, ছায়া, স্থির জামগাছ।

শৈলজারঞ্জনের গানের ক্লাস

আমি দেখি তোমাদের ফুলগুলি ফুটে উঠছে কিনা। কোনো কোনো ফুল ফুটে ওঠে। সবগুলি একসঙ্গে নয়। তোমরা গান গাইতে থাকো। নিমগ্ন এক এস্রাজ থেকে উৎসারিত হয় গান। তিমির রাত্রি অন্ধ যাত্রী··· । শুনতে শুনতে চমকে উঠি। মতিলাল নেহরু রোড থেকে দেশপ্রিয় পার্ক ইস্ট। যাত্রীদের অন্ধতা আরো অনেক অনেক বিস্তৃত পথ পার হওয়ার প্রশ্নে জড়িত। অন্ধতায় জড়িত বিকেল, এস্রাজ, দু'একটি কাকের হঠাৎ-হঠাৎ ডেকে-ওঠা এবং সেই পথ পার-হওয়া যা পরাবাস্তবের।

সমস্তকিছুর পিছনে 'ঈশ্বর' রয়েছে—ভাবলে সুবিধে হয়, চোখ বুজে ফেলা যায়। কিন্তু সেভাবে ভাবি না। ভাবি আরো একটু জটিলভাবে—ঈশ্বরহীনভাবে—যাতে ক্রমশ ধূসর হয়ে ওঠে মনোহরপুকুর, ফিরে-আসার রাস্তা। ফিরে আসার রাস্তাও অবশ্য একাধিক, অনেক। প্রত্যেকটি রাস্তাই অন্ধতার প্রশ্নে জড়িত।

গান শুনতে শুনতে লক্ষ করি তোমার ফুলগুলি—জবা, সূর্যমুখী, গোলাপ, জুঁই, রক্তপলাশ—একে একে ফুটে উঠছে। বেজে চ'লেজে এস্রাজ।

অরুণ বসু

ভুবন ও কামপোকা

ভুবন যেখানে এসে মিশেছে ভুবনে
তার ঠিক মাঝখানে মাধ্যাকর্ষণের
নিচে কামপোকা এক পরম যতনে
সাজায় সেঁজুতি, শঙ্খ, সান্ত-বর্ষণের
শস্য, বীজ, লোধ্ররেণু, বেণুবনে-বনে

কিন্তু ভেবে দ্যাখো, 'কাম' শব্দটি এখানে
মানালো কি ?—তবে এই শব্দ ব্যবহার
কুলায় ফিরিয়া যাওয়া পাখিদের গানে
কাক ডেকে উঠে সুর কেটে দ্যায় তার—
যে বুঝেছে, সে-ই এর অর্থ কিন্তু জানে

তবুও 'ভুবন' এই শব্দের ভিতরে
মুগ্ধ কামপোকা এক বলেছে, 'নদীর
অনেক অতলে জন্ম-রহস্যের ছড়ে
খুলে যায় উদ্বর্তনে নক্ষত্রের নীড়।'

মুগ্ধ কালো দিন

ঘনঘোর, ওই চ'লে যায় রাত্রি, মৃত্যুর উলঙ্গ মুগ্ধ দিন
উদ্দামতা, তুমি তাকে ডেকে নাও পতাকার মতন স্বাধীন

অনন্ত আকাশ, তুমি চেয়ে দ্যাখো, সম্পূর্ণ ত্রিকাল
ঘাড়-হেঁট, মুণ্ডিতমস্তক ওই সহস্র যাজক হেঁটে যায়
হেঁটে যায় আহ্নিকগতির পাশে গুপ্তঘোরা
যৌবনের লুপ্ত অভিমান

সেই গান মানুষকে স্বাধীনতা দেবে ? ছবির মতন
হাতে বাঁশি, উদোম-শরীর, তাকে রমণীর মতো বলো কে আর জড়াবে ?
সাজানো সবুজ ফল দেবে কি প্রবুদ্ধ-জল, হাঙর-কুমির ?

অজ্ঞাতবাস

তুমি জানো, মহিষের পিঠে চ'ড়ে রাখালবালক আজ
চাঁদে চ'লে যাবে
এর চেয়ে কাল্পনিক কিছু নেই মানুষের কাছে সত্য আর
নাদব্রহ্ম তবু ছুঁয়ে দ্যাখা তো হ'লোনা
এ-সবই ছলনা জানি, কালো দিন ক্রমশ আলোর
ভিতরে লুকিয়ে রাখে কমলালেবুর মিষ্টি-কোয়া
তাকে ছোঁওয়া এতো কি সহজ ?

ঘনঘোর, ওই চ'লে যায় রাত্রি, মৃত্যুর উলঙ্গ মুগ্ধ দিন
উদ্দামতা, তুমি তাকে ডেকে নাও পতাকার মতন স্বাধীন
তুমি তাকে ডেকে নাও পতাকার চেয়েও স্বাধীন

ভারতবর্ষ

সামান্য কোটরে দ্যাখো, অই দ্যাখো, বেড়ে উঠছে কিরকম ঋষির সংসার

যেন অর্ধনারীশ্বর, যেন তিন ভুবনের মতো মুগ্ধ মোহান্ধ-আবেগ
ছলাৎ-জলের নিচে মেদুর-করোটি, ক্ষীণ, ভেসে যায়

যে চায়, তাকে সে সবুজ ফল উপহার দ্যায় দিব্যদ্যুতির উজ্জ্বল
মঞ্জরির মতো তাকে স্পর্শ ক'রে আছে মায়া-অমৃতের মঞ্জু-অর্থ :
'দ্ম'

প্রিয় হে সবুজ ফল, তুমি তার হাতে তুলে দিও
রম্যজল

দম্য
দয়ধ্বম
দক্ত

মণীন্দ্র গুপ্ত

নিত্য মালাকারের কবিতার বই সূত্রধারের স্বগতোক্তি

১.

নিত্য মালাকার বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই। কোনদিন আমাদের দেখা হয় নি। তাঁর জীবিকা কি, নেশা কোন্ দিকে জানি না। কত লোক সম্বন্ধে তো লোকে কথা বলে যায়, কিন্তু তাঁর কবিতা সম্পর্কে ভালো বা মন্দ কিছু বলে না কেউ। এই উদাসীনতা, আড়ালে থাকা একটা কিছু বুঝিয়ে দেয়। যা হোক, এতে একদিক থেকে ভালো হল। নিদাগ সাদা কাগজের মতো মন নিয়ে 'সূত্রধারের স্বগতোক্তি' পড়তে লাগলাম। কবিকে অন্তত কিছুটা সাবয়ব করতে পারলে কবিতা বুঝতে সুবিধে হয়। সুতরাং পড়তে পড়তে আমি নিত্য মালাকারকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করলাম, তাঁরই বইয়ে যে মালমশলা ছড়িয়ে আছে তাই দিয়ে।

নিত্য মালাকার ষাটের কবি। দেখা যাচ্ছে, ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে তিনি কবিতায় মনোনিবেশ করেছেন। অজ্ঞাতবাস, অরুণ বসু ও অরুণেশ ঘোষ তাঁর বন্ধু। অতএব নবদ্বীপ ও কোচবিহার, গঙ্গা ও তোর্সা, শান্ত ও অশান্ত তাঁর সবিশেষ পরিচিত। গ্রন্থটির স্বল্প দেখে অনুমান হয় নিত্য গার্হস্থ্যে প্রবিষ্ট।

৪২ পৃষ্ঠার এই বইটিতে ১৯৬৬-৮৭'র মধ্যে লেখা ৪৩টি কবিতা ছিমছাম পরিচ্ছন্ন সাজানো। ২২ বছরে ৪৩টি কবিতা! বোঝা যায়, এই কবি লিখতে গিয়ে মমতাহীন, ছাপতে দেবার আগে কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন, এবং বইয়ের ব্যাপারে নির্বাচননিষ্ঠ। এই সংযম তাঁর চারিত্রিক সততাবশত, এই কাণ্ডজ্ঞান তাঁর চর্চা ও অভিজ্ঞতার শিক্ষা। কবিতার মধ্যেও এর ইঙ্গিত রয়ে গেছে।—

১। কিন্তু আমি শব্দ ছুঁড়ে এখনো পারি নি লিখতে তেমন কবিতা,…
শুধু সম্ভব নয় আজও, মিথ্যাশব্দে কবিতায় আত্মোপকারিতা।

২। অনেক বলার ছিল, কিন্তু এই প্রতিহাওয়া…
আমি কিভাবে কলম ধরবো ভয় হয়, বিভিন্ন শব্দে শিল্প, অনুরাগ

অজ্ঞাতবাস

নিয়ন্ত্রণ সহজসাধ্য কি হবে ? আমি ভাবি, নাহ্—
কিছুই বলবো না ;
বরং এসো ভাতের গল্প করি—কী কী খেলুম এ-জীবনে···
আমি কিছুই বলবো না পাছে ইন্ধন উস্কে বা ভিজে যায়,

এই সব সমস্যার সঙ্গে নিত্য মালাকার অসহায়ভাবে আরও টের পান, এই কৃত্রিম দেবীর কাছে দুর্বল, বাসনাবিধুর কবিদের আশ্রয় যাচ্ঞা কত ভঙ্গুর :

খুব ভুল এই পদবিন্যাস আর কবিত্বগর্ব
খুব ভুল এই ক্ষুধা ও তৃষ্ণার পদ্য, লাঞ্ছনার পদসেবা
মুখ তোলা, আঁজলায় ভরে তোলা জল

এই ভুল, এই দুঃখ শুধু আজকের কবিদের নয়, অতীতের, ভবিষ্যতের, আবহমানের কবিদেরও।

শুধু ভুল নয়, কবিমাত্রই জানেন, আপাত-অর্থহীন উদ্ভট বাক্যও কখনো কখনো মাথার মধ্যে ঢুকে যায়, তারপর আর তাকে ছাড়ানো যায় না। বাইরে থেকে না কি অচেতনা থেকে আসে তারা কে জানে। তারপর সেই ঠুনকো, অস্বাভাবিক কথাটিকে ঘিরে ঘিরে ঊর্ণনাভ ক্রমশ জাল বুনতে থাকে—সেই জালে একদিন ধরা পড়ে 'অত্যাশ্চর্যতা কিংবা স্বাভাবিক'। কবিদের এই অভিজ্ঞতাটি চমৎকার বলেছেন নিত্য :

'কুকুরেরা কিছুই জানে না পৃথিবীর'
এই রকম এক উদ্ভট বাক্-বিন্যাস নিয়ে আমি ইদানীং
পথ হাঁটছি মন্থর
আমি জানি এই শেষ নয়, আরো আছে অত্যাশ্চর্যতা
কিংবা স্বাভাবিক

উদ্ধৃতির শেষ দুটি লাইন বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। জাদু থেকে কবিতার আবির্ভাব, এবং আবিষ্ট হতে হতে অশেষ ব্যঞ্জনার দেখা পাওয়া—এই কথা যেন দাগ দিয়ে বলে দিলেন নিত্য। এই কবির সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বাড়ে। কিন্তু নিজের ও বাইরের কোন পর্দাই তোলা যায় না। ভাষা দিয়েও শুধু বোবার মতোই আভাস দেওয়া যায় মাত্র। নিত্যও খুলে দেখাতে না পেরে ব্যঞ্জনায় বোঝাতে চেয়েছেন তাঁর জীবন, তাঁর চেতনাজগৎ : বাইরের পৃথিবী, স্রোত, তাঁর চেতনার মধ্য দিয়ে যায়, রঙিন মাছ না, পিঁপড়ের মতো—ভিতরে কী প্রতিক্রিয়া হয়, কেমন রূপান্তর ঘটে—ভিতরের তীব্রতা কি ভিতরেই ভীষণে লীন, অবদমিত, কিংবা সেই জীর্ণ ধোঁয়াশরীর নিষ্ক্রান্ত হয়েছে লিরিক-ব্যতাসে :

একবারো তুলে দ্যাখাতে পারিনি তবু বোঝাতে চেয়েছি
আমার ভেতর দিয়ে যারা যায়—সোনালী রূপালী
মাছের উপমা নেই, পৃথিবীর ঘাসে ঘাড় হেঁট

চিনির কেলাসে মুগ্ধ সংঘযান, প্রজন্মকাতর
মাটির যোনির দিকে পথ—সংঘারাম

আমার ভেতর থেকে বাহ্বাস্ফোট, কঙ্কালের চোয়ালের
স্খলিত বিবশ ক্রোধ—কালহীন চোখ
লক্ষ্য স্থির, নাসারন্ধ্রে মহানুভবতা হাসি জরাজীর্ণভাষা
—কোথায় চলেছি
জানে কিছু লিরিকেরা গিহিন বাতাসী, সামান্য পলক
জীবন গোপন করে রতিগ্রাহ্য এইসব কলসির ধোঁয়া

ছাতিমের গুহামূলে নিদিধ্যাস—শেখার প্রণালী
যা কিছু গোপন এই ব্যবহৃত গুহ্য-গূঢ় নিষেধ, আড়াল
পাথর লিঙ্গের মূলে লাস্যজল, উৎসাহিত নাভিপদ্মে মানুষগাছের
বিমূঢ়-সঙ্গম ক্রোধ সতত ধূমায়মান, বোঝাতে চেয়েছি।
(বোঝাতে চেয়েছি)

২.

আগেই জানিয়েছি, নবদ্বীপ আর কোচবিহার নিত্য মালাকারের আপন জায়গা। প্রত্যেক কবিরই লেখায় নিজের জায়গাটি বিস্ময়ের দেশ হয়ে ফুটে থাকে, যেন তা অপার্থিব। করামলকের অনুপুঙ্খ রেখার সঙ্গে মেশে দিন-রাত্রি থেকে চুইয়ে আসা আলো, অনালো, মায়া। এই কবির বেলাও তাই ঘটেছে।

১। সুদূর বাংলাদেশের মানচিত্রের ওপরে এককোণে
একটা কালো বিন্দুর মধ্যে থাকি,
খুব ঘাড় গুঁজে থাকা ;
কোনোক্রমে চাদরের ঢাকনার তলায়
সারাবচ্ছর শীত আর বর্ষার আচ্ছাদনের নিচে
নিজেকে বাঁচিয়ে চলা।

নিশ্চয় এ জায়গা উত্তরবঙ্গের—সেই শীত আর নাছোড় বর্ষার দেশের।

২। কয়েকটি এক পা তোলা মোরগের বিস্ময়···
মোরগদল পার্শ্ববর্তী সবজিক্ষেত বীজতলা
চুঁড়ে তছ্‌নছ্ করছে
কোন্ এক জনস্থান মধ্যবর্তী চাপড়ামারিতে ॥

৩। সে এক নদীর পাড়ের দেশ—মাছ নৌকো নিকিরি মাসি বেশ্যাদের কথা
এর পরও আস্ত জীবন রয়েছে তবু চাপড়ামারি ভূগোলে আঁটবে কিনা

অজ্ঞাতবাস

৪। শীতের কুয়াশা ঢাকা দূরপথে সন্ধ্যা নামে
খলিশামারির দিকে সব উজ্জ্বলতা
প্রতিপ্রশ্ন করে, 'কী চাও এখানে তুমি—কোদালের মায়া ?'
আমিও পারিনি ছাড়তে, ফিরে গেছি সবজি ক্ষুধার কাছে

চাপড়ামারি, খলিশামারি কি ঘুঘুমারি গোসানীমারির নিকটস্থ ?

এর পর, গরিব বাঙালি গ্রামের একটি বর্ষাসন্ধ্যার ছবি :

আর অন্ধকার হচ্ছে—দেখছি, পচাবৃষ্টি আর থিকথিকে কাদায়
বাড়ির চারদিকে ধোঁয়া উঠছে।

এই কবিতাপঙ্‌ক্তির অনুষঙ্গে অবধারিতভাবে মনে পড়ে কোনো পুরোনো কবির লেখা : বর্ষাকালে বাঙালির নিরানন্দ জীবনের চিরন্তন ছবি :

চলৎকাষ্ঠাং গলৎকুড্যামুত্তানতৃণসঞ্চয়ম্।
গতু পদাথি মণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গৃহং মম ॥

প্রায় ভেঙে পড়া কাঠের খুঁটি, মাটির দেয়াল গলে যাচ্ছে, তৃণ উঠছে, আমার জীর্ণ ঘর মণ্ডুকাকীর্ণ হচ্ছে ॥

আরেকটি উদাহরণ। জলবন্দী গ্রামের একটি অতিসংক্ষিপ্ত চিত্রনাট্য :

উল্লাপাড়ায় শেয়াল ডাকছে হুক্কাহুয়া,—তারি বৃন্তে বাংলাদেশে উধুনিয়া
নামে একটা গ্রাম আছে বর্ষাকালের। বিশাল টইটুম্বুর পুকুরের চার পাড়ে
ঘরবাড়ি গোরু ও খড়ের পুঁজি বৃষ্টিতে ভিজছে। ···বাঁদিকে দেখলো,
পিছল উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সমস্যায় পড়েছে সে। সে ওপরে
তাকালো, কী ভাবলো, কে জানে।

এইসব কবিতা পড়তে পড়তে আমার আরো একবার প্রত্যয় হয়, কবিতা বাস্তব জীবনের কত কোল ঘেঁষে থাকে।

অতঃপর নিসর্গ, মানুষ এবং মানবজীবনের উৎসব-ছুটি-মুক্তি-ও-সম্পর্ক প্যাটার্নে নিলীন একটি মনোময় কবিতা, পিকনিক : স্কেচ।—

ব্রীজের ডানদিকে নদীর কিনারায় দাঁড়ানো যে সব গাছ, ঝোপজঙ্গল
আছে, ঠিক সেখানেই পিকনিক। আজ রবিবার, ধরা যাক অসম্ভবের
দিন। মাংস সাঁতলে নিতে আগুন গুটোন হলো ; আর চুলো উস্কে
দিতে তিনজন হাত লাগালো। চেলাকাঠের দগ্ধাবশেষ নিয়ে একজনের
দু'টুকরো টেংড়ির পেছনে বহুক্ষণ চেষ্টা।

আমি ভূমিকাহীন, তবু সম্পর্ক মধুর ব'লেই—সকলেই, এমন কি লাল
নীলাভ আগুনের শিখাও হেসে আগ্রহে, একটু, যেন গা-লাগানোর জন্য—
কিছুই না, সহযোগ ; এরকম বলছে।

আমি ভাবছি, রঙকানা হইনি তো ? কিংবা মাছ,—যেমন জলেই ঘুমোয়,

চোখের পাতা নেই, মৃত্যুতেও শাদা ; তবু তো বিকার থাকে।

পিকনিক, হোরহুল্লোড়। আর একটুপর—মহিলা ও মেয়েরো সন্ধ্যাকেও
আসতে দিচ্ছে না বনে। আমি আড়ষ্টতার পিঠে সম্ভ্রম জুড়ে দিয়ে দিব্য
দেখছি, সতিই অন্ধ হয়ে গেছি।

৩.

এরই মধ্যে ফাঁকে-ফোকরে, এবং তারপর দিনে দিনে ক্রমশ হৃদয়-মনের সঙ্গে পৃথিবীর উজ্জ্বল লেনদেন স্তিমিত হতে থাকে। জীবন শেষ হয়ে আসে, কিন্তু শেষ দিনেও অস্তিত্বের অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।—

গায়ে এত শ্যাওলা জমেছে যে একদিন এই দ্যাখার চোখ দুটোও বুঁজে
আসবে জঞ্জালে। শুধু ওই লাল হৃৎপিণ্ডটুকু আর কতো থাকবে, কতো
দ্যাখাবে। ম'রে যাবো একদিন, কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা না-রেখেই।

নিত্য মালাকারকে ক্রমশ আমি এইরকম দেখতে পাচ্ছি—জীবনের প্রশ্নাবলি নিয়ে ভাবিত। প্রথম দিকে নিত্যর কবিতায় এক ধরনের রুক্ষতা এবং কিছুটা আবেগ মেশানো ছিল। মনে অনেক সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ওঠে। কিন্তু হৃদয়াবেগ তার উত্তর দিতে পারে না। 'হৃদয় নামক ঐ গোষ্পদ খোঁদলে' আর কতটুকুই বা ধরে। বুদ্ধি ও মেধা অন্য তৃপ্তি দিতে পারে, কিন্তু তাদের দেওয়া উত্তরও পরভৃত গোত্রের। অতএব নিত্য হৃদয়াতীত এক রকম কারুণ্যের সন্ধান করেন—রহস্যের কাছে উত্তর খুঁজে খুঁজে আহত হতে থাকেন। ক্রমশ তাঁর কবিতা স্বাতন্ত্র্য পায়। নিগূঢ় ব্যঞ্জনা আশ্রয় করে তাঁর কবিতাকে। নিচে কবির চিন্তা ও উপলব্ধির কিছু যথেচ্ছ উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এলোমেলো, কিন্তু এরা একই অবিরাম চেতনার ধারা থেকে নির্গত, রহস্যময়, এবং সৌন্দর্যে মণ্ডিত।

১। দূরে কেউ অন্ধ হচ্ছে, দূরে কেউ বাড়িয়ে দিচ্ছে তার ভিক্ষার হাত।
দূরের সেই অনিশ্চয়তা, অন্ধকার ও তার ধীর নিশ্চিত অদৃষ্টগ্যামী ক্ষয়কে
আমি ছুঁতে চাইছি। কাব্যকৌতূহলকে চরিতার্থ করার হরেক উপায়।···
এইরকম পালিয়ে বাঁচাই কবিতা···কোন্ অবদমন থেকে এসব আসে ?

২। চরাচরে জেগে আছে শুধু ঐ বিশাল ছাতিম গাছ,—কালজীর্ণ, কিন্তু নুব্জ
নয় ! সব গল্প শেষ হয়ে গেলে যে সারমর্ম বেঁচে থাকে, সে তাই।···
শিশ্ন ও উদর চর্চার ফাঁকে এই মস্তিষ্ক চালনা ব্যাখ্যা কোন্ আনন্দের গান
গায়, বিষাদের ভূমিকে উর্বর করে ? কোন্ ভাঁরু আবেগপ্রবণ মানুষের
পালিয়ে বাঁচার লক্ষ্য এই পদ্য লেখা ?

ঘটনা, নিষ্পন্দ নিথর নয়।

হৃৎপিণ্ড একবার 'হ্যাঁ' বলছে, একবার 'না' বলছে। এই দোলাচল যেদিন থামবে সেদিনই অসুখ সেরে যাবে।
কিন্তু তার আগে রাত্রি, কুয়াশা ও মেঘ আর একবার গ্রাস করুক এই পৃথিবীকে, যাতে উৎসে যেতে পারি।

৩। তবু আমি দেখি
ক্লান্তদর্শীর শেষ আয়ু ও নির্বাণ আর বঁড়শিতে গাঁথা মাছ
বাতাস ও কটাহ যাকে দুপুরে ভেজেছে॥

৪। নদীকে শোনানো যাবে কোন গান,
মনে হয় কোনো শব্দ শৃঙ্খলেই বেঁধে রাখা যাবে না সময়
একদিন ভালোবেসেছিলে তুমি পাথরকে খুব
সে কি উঠেছে ব'সে ন'ড়ে-চ'ড়ে, উপমাবিহীন সব
বশম্বদ শব্দ-স্তূপ ঘাসফুল গজিয়ে গিয়েছে তার চারদিকে

৪.

এবং এই এত সমস্তেরও পরে কবি নিত্য মালাকারের মনে হয়, যে-কথা তিনি বলতে চান, কবিতার সর্বজনমান্য গুঞ্জরনময় আঙ্গিক আর তাকে ধারণ করার পক্ষে উপযুক্ত নয়। তিনি 'শব্দ ও রূপের খাঁচা' ভেঙে ফেলতে চান। অবশেষে স্পষ্ট গদ্য, কিন্তু জটিল ইঙ্গিতময় ভাষা অবলম্বন করতে হয় তাঁকে। একটি কবিতার মুখবন্ধে, এবং আবারও পরিশেষে, বলেন: 'টানা পদ্যে তোমাদের আর ধরে রাখতে পারছি না বলেই এই কপটতা বেছে নিলাম।' সময়ের, মনের, কবিত্বের এবং স্টাইলের তফাত দেখাবার জন্য পূর্ব ও উত্তর পর্বের একটি করে কবিতার অংশ উদ্ধার করছি। দুটিকেই প্রেমের কবিতা বলে শনাক্ত করা যাক।—

১। তোমার মুখের পাশে সাদা ঘ্রাণ, মৃত এক নক্ষত্রের আলো
তোমার উরুতে বিষ, স্বপ্নের কামুক রেশ রয়ে গেছে আজো
হয়তো আমার নয়,—তবু আমি অইখানে গিয়েছি মায়ায়
বশ্য শিকারের কাছে ওত্ পেতে কিছু ভুল তুলে এনে
দেখেছি জীবন
হয়তো বিন্দুর মতো, জলের দাগের মতো—পানের পরের এই
গেলাসের স্মৃতি

২। তুমি তো পিঁপড়ে নও, তবু তোমার সূক্ষ্ম চিমটির ভয়ে সব সময় এড়িয়ে চলি। তুমি ছোট্ট জলের ফোঁটা হয়ে যখন ছড়িয়ে পড়ো পৃষ্ঠায়, অক্ষর বাঁয়ায় হয়। এসব ভুলে থাকি কিছুদিন।

পদ্য নয়, গদ্যই যে কবিতার উচ্চতর স্তরের উপযুক্ত বাহন, আমার এই বিশ্বাস নিত্য মালাকারের লেখায় আরো একবার সমর্থিত হল। ময়ূর, হাঁস এসব শৌখিন

বাহনে দেবদেবীরা হয়তো শুধু বসতে পারেন, কিন্তু সত্যি সত্যি উড়তে পারেন না। 'কালিদাসের অর্ধসমাপ্ত ডাল' কবিতাগুচ্ছ এই পর্যায়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ঐ সব বক্তব্য কোনো তথাকথিত লিরিক পাত্রে রক্ষা করা যেত না।
উল্লিখিতি ঐ উত্তরপর্বের গদ্যভাষাও ক্রমে কবির যথেষ্ট মনে হয় না। রীতিহীন, এরও বাইরে যেতে চান তিনি। কি চান কি হতে পারে, বোঝাতে চেষ্টা করেন তিনি, আর সেই কবিতাগুলির নাম দেন 'কলমের বাইরে'।

পুরনো স্মৃতির সাথে মাঝেমধ্যে দ্যাখা হয়। ছেঁড়া, ময়লা হ'য়ে ওঠার আগে যে আবেগ তার কথা ভেবে আর লাভ নেই। যারা এগোয় তারা তো আর ওখানেই আটকে থাকে না। এসব মৃতের আক্ষেপ শুনে কার কি লাভ হবে? জন্মে জন্মে শব্দ তার বাচ্যার্থ ভুলতে ভুলতে ব্যঞ্জনার জন্য আরো জটিল, সুন্দর হয়। পাত্রের আকার আয়তন বুঝে ঘর করে,—খুব সামান্য জীবন তার, কবিতার মতো নয়।

এখন, এই বর্তমান প্রত্যক্ষ আলো বা আয়নার সামনে কেবলি নিজের মুখ অবিশ্বাস্য অতিরেক হ'য়ে পড়ে। গালে হাত দিয়ে ভাবি, কোনো দূরাগত বাতাস বৃষ্টির ধ্বনি শুনতে কি পাস্?

রোদ ও মাঠের শূন্যতা ভেঙ্গে অচেনা অক্ষর সব ক্রোধে ঝিকিয়ে ওঠে,
'অন্ধকার কি এর চেয়ে ভালো নয়, স্বচ্ছ নয়, অর্থপূর্ণ নয়?'

(কলমের বাইরে ৫)

সূত্রধারের স্বগতোক্তি নিত্য মালাকার অজ্ঞাতবাস ফ্ল্যাট—সি/১ আর-এইচ-ই ৩০ই রামকৃষ্ণ সমাধি রোড কলকাতা ৭০০ ০২৪ দাম পাঁচ টাকা

সঞ্জীব প্রামাণিক

নপুংসক

১-
এখানে সবাই পুরুষ, কেবল আমিই নপুংসক
সবুজ বাংলাদেশে আমি মরণ, খরা
পুরুষ আমাকে দ্যাখে, আর দেখে দেখে শুধু হাসে
নারীরা আমায় দেখবার ভয়ে ঘুরিয়ে নিয়েছে মুখ।

২-
আমার মরণ প্রকৃতি, বসন্ত বিষঋতু
কোকিলের গান আমায় আহত করে
ফুলের ভেতরে লুকিয়ে আমার অসফল সংকেত
আমার দহন না-জ্বলার কারণেই।

৩.
ভুলতে পারতাম সব কিছু আমি। কিন্তু স্বপ্ন
ঘুম থেকে ডেকে তোলে
স্বপ্নে সমুদ্র, স্বপ্নে ছাতা, স্বপ্নে হারমনি'
জাগিয়ে তুলে আসলে ফের মরণের দিকে ঠেলে।

৪.
সমুদ্র, কিন্তু কেন ?
কেন তার নীল জল ?
যে-আঠা মরণ
তা কেন মিশেছে
সারা সমুদ্র জল ?
আমার পান হা-হুতাশ
এ জল পেয় নয়।

৫.
যে মানুষ খরা
যার অভিধানে

বর্ষার নাম নেই
তার কাছে ছাতা
ভাবতে পারি না।
ভাবতে পারি না
যুদ্ধ থাকবে
যোদ্ধা থাকবে না !

৬.
সুর বলতে কান্নাকে বুঝি। একবার কেঁদেছি
যখন এ পাখিকে কপাল চাপড়ে বার করলেন মা
এমন কি দাই একবার দেখে ফিরিয়ে নিয়েছে মুখ
যার কাছে সুর কান্নার মত, কণ্ঠ রাজহাঁসের
হারমনি কেন ? কোথায় মিলবে কণ্ঠলগ্নাকে ?

৭.
সমাজ হাসে হাসুক — আমার জ্বলে ওঠার কারণ
মেয়েরা জানুক — হাসাতে এসেছে একজন না-মানুষ
পুরুষ জানুক — লড়াই-এ না-নেমে হেরেছে একজন
শিকারীও নই — তাছাড়া শিকার হবারও যোগ্য নই।

৮.
হোক আমার গোপন অঙ্গ সূর্যোদয়ের দেশ
মহীরুহের শিকড় যেন আমার গোঁফ হয়
রাজপথ হোক আমার বুক
আমার উত্থান।

৯.
তখন ভয় থাকবে না সমুদ্রে
কেন না সমুদ্র আমার পাঠযোগ্য হবে
সব জল, লবণ ও আঠা টেনে নেব পদ্মের মৃণাল
নীলের খোসা ছাড়িয়ে বার করব আমার মুগ্ধতাকে।

১০.
তখন ছাতাকে মেলে ধরব যে কোন গরল-রঙা আকাশে
যেন বিষকে শোষণ করছে এমন কোন পাথর

অজ্ঞাতবাস

আর ইশারা করব যে কোন মেঘকে
বৃষ্টির বিরুদ্ধে শুরু হবে আমার অভিযান

১১.
আর হারমনি ! আমি তখন সুরদাস।
তানসেনের মত সহজ ও পারঙ্গম হয়ে উঠব
যে কোন সুরকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করবে আমার কণ্ঠ

১২
যেন একটি কলম কাগজের সঙ্গ পেতে চাইছে।

শেখর মৈত্র

প্রজ্ঞাকথকতা

মহাপুরুষ হতে গেলে সমূহ গুণাবলী দরকার যা' যা'
সকলই তাহার ছিল, যথা ডিগ্রী, মুদুস্বর, নত ঘাড়
দৃষ্টি ফুটপাতে, বিসর্জনের তাসানৃত্যে কখনো সে মাতে নাই
অথবা রোয়াকে, স্পর্শদোষ ছিল না এমনকি রাজনীতিতেও

হংসমধ্যে বকোযথা, কিংবা সে পরমহংস, দ্যাখে নি তো ডিম
ফুটে গেলে কী সুন্দর পেলব যুবতী হাঁস প্যাঁকপ্যাঁক-স্বরে
পৌঁছে দ্যায় ঋতুগন্ধ, দোলাচল, মসৃণ সামাজিক ক্রিয়ার
প্রস্তুতিস্বপ্ন, সাধ ও আহ্লাদী-ঠোঁটে সদ্য-তোলা
খান দুই রবীন্দ্রসংগীত এবং কেষ্ণনগরী সরপুরিয়ার মতো
উপাদেয় ও সুস্বাদু শিল্প কিছু নরম ও রহস্যে মাখামাখি

ক্ষীণকায় অধ্যাপক, গ্রন্থাগারের ধুলো, মাকড়সা ও ঝুল
—এ'সবই চিনিত সে, এবং ভাবিত
সকল হাঁসেরা আজো সকল হাঁসেরা বুঝি সরস্বতীর পোষা অনুগত।

বুদ্ধিমান যাহারা, গাণিতিক প্রক্রিয়াদি যাহাদের করতলগত
তাহারাই জানে শুধু : হাঁস ও সরস্বতী উভয়েই যায়
একদিন কশাইয়ের গৃহে।

গৌতম হেঁস

স্বপ্নে, বহ্নুৎসবে

সারাদিন একটানা অফুরন্ত বৃষ্টির ভেতর
গাঢ় নীলিমায়, দূরে, শতাব্দীর শেষ নারী হেঁটে যায়, রৌদ্ররশ্মিকণা
একি তবে উদ্ভাসিত আলো, শমীগাছ, অমাযামিনীর
দুরন্ত কুহক, অগ্নি, কম্পিত ফসল।

এখন রূঢ়তা শুধু কুয়াশায়, ভোরে, অপরাহ্নে
জানালার ফাঁকে ফাঁকে মুক্তোবিন্দু, জল—
একি অশ্রু দয়িতার, পৃথিবীর অন্তিম উচ্ছ্বাস
অবিরল গুঞ্জরণ নক্ষত্র ও অশ্রুর ভেতর।

এত সতর্কতা, স্বপ্নরত, ব্যাপ্ত তবু নিপুণ কৌশলে
অনিকাম দুটো চোখ বড় দীর্ঘ আশ্চর্য সরোদ—
অপর্যাপ্ত আলো দেখ হলুদ বসন্তে, গানে, পূর্ণিমাসন্ধ্যায়।

সুব্রত সরকার

সজীব সংবাদ

সকালে চায়ের কাপে, ভেসে আছে
অলৌকিক সজীব সংবাদ।
রুক্ষ ঝাঁকড়া চুল, গ্রন্থিল পেশী আর
মাইনাস পাওয়ারের চশমার আড়ালে
মধ্যবিত্তের ভাতের থালায় ইলিশের পেটির সাইজের
হৃদয়—
আজ পথের মোড়ে
সাবানের রঙিন বিজ্ঞাপন হয়ে নাচে।

ভুরুর ওপরে লাল টুকটুকে ব্রণটাতে
হাত বোলানোর শিহরণ

অজ্ঞাতবাস

অলৌকিক সংবাদের কুক্ষিগত জেনেও
ব্রণটাতে হাত দিই ; আর
সংবাদবাহী চায়ের কাপে দেখি
দার্জিলিঙের সবুজ—সবুজ বাগিচা

প্রভাত সাহা

জল

জল আজ জলের গভীর আড়াল

যেখানে সমস্ত অক্ষর
প্রতিমার নিষ্পলক অনিদ্রা ধুয়ে নেয়

জল আজ স্মমেহন ; জলের আগুনে পোড়ে
পোড়া চোখ খুলে মেলে ধরে অন্ধ দৃষ্টিপাত

গোপনে
জলের অশ্রুর ছাই হয়ে হেসে ওঠে জলের ভেতর

প্রদীপ সাহা

প্রস্তুতিপর্ব

ভূতগ্রস্ত রৌদ্রস্নান সারা হলে
ফিরে যাই রিক্ততার ছায়ালোক ছুঁয়ে

দৃশ্যের মার্চপাস্ট, স্বৈরিণী কৃষ্ণচূড়ার ওপরে চাঁদ
শব্দের পালক বেয়ে উঠে আসে মাংসল রাত

উরুসন্ধিতে স্থপতির অহংকারের পাশাপাশি
দেশলাইয়ের বাক্সে জমে খণ্ড খণ্ড গেরিলাআক্রোশ

সুব্রত পাল

ছাই

দূরত্ব কিছু রাখতে চেয়েছিলাম
তুমি তা রাখলে না

যত কাছে এলে—তিলের সৌরভ
ছাড়িয়ে
ব্রণর দাগ স্পষ্ট হলো
তুমিই পোড়ালে পাতা, বর্ণলিপি…

এখন টেবিলে তার ছাই

গান ১

ব্যাণ্ডেল-কাটোয়া লাইনে, ট্রেনের কামরায়
মাঝে মাঝে আমি এক অন্ধ ভিখিরিকে গাইতে শুনি—
'এ মণিহার আমার নাহি সাজে…'
তার গলা থেকে, হার নয়, ঘুণে খাওয়া পাঁজরের মতো ঝুলে থাকে
ছাল-ওঠা, ভাঙা-রীডের, পুরোনো একটা হারমোনিয়াম

অন্ধের পায়ে পায়ে তার বালিকা মেয়ে
স্কুলে নেই, য়ুনিফর্ম নেই, ক্যাড্‌বেরী নেই
আমাদের সামনে এসে মেলে ধরে
শীর্ণহাত, খিদে

প্রবাসী

বাতাস-তাড়িত তুমি বালি ও জীবিকা ছুঁয়ে
চলে যাও দূর দেশে

এই ঘাসে তোমার রাত্রিও ঘামের দাগ…
এখানেই মুখ থুবড়ে মানুষ ভেঙে যায়
এখানেই জন্ম হয় শিশুর ॥

অজ্ঞাতবাস

অরণ্যপ্রহর

গহনে পাতার ঘুম, সমৃদ্ধ শয়ন
অরণ্যপ্রহরে তার দিব্যজাগরণ

শাখায় শান্ত ছাপ, প্রলয়ের পর
পাখি তার ওষ্ঠপুটে খুঁটে আনে খড়

যে লোভে নদীর যাওয়া সমুদ্র-সফরে
সেই ঢল, নম্রতোয়া, বোধের শিকড়ে

মাটিতে আঁচড় কাটি মুকুলে গড়াই
নাড়ি ছুঁয়ে হেসে ওঠে প্রজন্মের ধাই

মগ্নরাত। সুখে থাকো সমূহ দম্পতি
দাবানল জ্বলেছিলো, নিবেছে সম্প্রতি

ইন্দু বর্মণ

অসহজ

একা একা যে যার বাগানে জলের ফোয়ারা ছোটাই
অথচ নগর উদ্যানে
শান্তি-সেনাদের ভিড়ে
দুজনে ওড়াই সাদা পায়রা প্রতিদিন।

এই খর-গ্রীষ্মে
তোমার বাগান থেকে ভেসে আসছে সুরভিত হাওয়া
আমি হাঁটতে হাঁটতে সামনে এগোই—
অন্ধরাগ দেখি, দড়াম শব্দে বন্ধ করে গেট।

ফিরে আসি ;
একা একা যে যার বাগানে জলের ফোয়ারা ছোটাই।

সোমেন ভট্টাচার্য

যৌবন এসে পড়ল

আমাদের একটা নদীর কথা
মনে পড়ল
অনেক দূরের নীল নদী
আমরা গাছের ছায়ায় ছায়ায়
সেই নদীর ধারে পৌঁছে ছিলাম

তারপর যৌবন এসে পড়ল

বীজ

কিছু গাছের বীজ তোমার হাতে
আমি হাওয়ায় ডুবে যাওয়া
একটা সন্ধ্যার সফলতা চেয়ে
তোমার কাছে আসি
তোমার কাছে যে সম্ভাবনা গাছের
আমার নদীর কল্পনা তার কাছে প্রবল

গাছ হয়ে ওঠাই প্রেমের সফল উদ্দেশ্য

অনুভব সরকার

সম্পর্ক

ওই মস্ত বাড়িটিতে মা একা আছেন।
বাবার দীর্ঘ তিরিশ বছর ক্ষয়ে যাবার ইতিহাস
ওই বাড়িটি জানে। এখনও মা পেটে বিকল
পিত্তথলি নিয়ে কোনক্রমে টেনে যাচ্ছেন দড়ি
তার চারপ্রান্তে আমরা চারজন—
ওজন ও উচ্চতায় ভিন্ন ভিন্ন চারটি রুচি

অজ্ঞাতবাস

বাড়িটি জানে, একদিন মায়ের প্রবল ইচ্ছেশক্তিই
খুলে দিয়েছে তার প্রবেশ—আমাদের বসবাস।

যে বাবা, নিজস্ব মতের পাথরে, পাথরের চেয়ে কঠিন
যিনি অশ্রু শব্দটিকে নারীর চোখ ভাবতেই অভ্যস্ত
একদিন তাঁকেও দেখেছি মায়ের ইচ্ছের স্রোতে ভেসে যেতে
ওই বাড়িটিকে তাই আজ মনে হয় মায়ের সিঁথি
রক্ত রঙে বাবা যেন আজও তাকে এঁকে দেন।

আমরা চারজন, ভিন্ন ভিন্ন চারটি রুচি
বাড়ির দিকে তাকিয়ে আছি, মায়ের দিকে।
মার হাত থেকে ক্রমশই খসে পড়ছে দীর্ঘ দড়ি
কে আগে কুড়িয়ে নেবো তাকে।

পরিচয়হীন

অন্ধগর্ব—বীরমাতা কাকে বল,
পরিচয়হীন শিশু যে ভাসাবে জলে ?

উৎসবে শঙ্খ শুনেছ, রণপথে
দীপক রাগিণী—দুই চক্ষু আবৃত হয়ে
আসে যেই, শুরু হয় ভয়ঙ্কর
ভুলের সেই সুন্দর অভিষেক—

ধাত্রেয়িকা, তুমি শুধু জানো
আর বীতনিদ্র নক্ষত্র জানে
মোহান্ধ 'ভাস্কর' ফেরায়নি, ফিরে গেছে
তাকে তুমি অভিশাপ বল, দুর্বাসা ?

লক্ষ লক্ষ 'পৃথা' ইচ্ছাবিলাসের স্রোতে ভাসে
ভিক্ষাপাত্র তার পরিচয়, শিশু আনাচে কানাচে, পথে পথে।

সন্তোষ সিংহ

পুরুষার্থ, পঞ্চম বিষয়ে

সমস্ত প্রয়াস আছে। শূন্যোদ্যান, মই, সুজাতার গ্লাস—জলের ও অন্ধকারের ক্রিয়াশীলতায়। আলোর সংঘর্ষ কি প্রয়োজন ছিল ? দাবদাহে সমূহ নিশিতি ? আলো—যা বিচ্ছুরিত করে দেবে প্রজ্ঞার বেদীতে। বেদী আসলে গোল। বস্তু বিশ্বের যা কিছু সঠিক সূত্র তা ওই পরিধিলগ্ন। জানি। আলোর সংঘর্ষে উঠে আসে সেই প্রকরণ, যাপন—যা কেবল ব্যাকরণ-বিলাস নয়, জীবনের নান্দীপাঠ, অপরাবিদ্যা যার নাম।

কথা হচ্ছিল ভালবাসার—বিশ্বস্ততার—শ্রমের—জীবিকার সৌর বিষয়ে। হস্তামলক এই গ্লাসে ওঠে রামধনু, ভাববাষ্পে সুজাতার গহন পৃথিবী, গোল ভালবাসা, প্রতিবাদ, প্রোটিনসমৃদ্ধ নগ্নতা। ওই দীপ্যমান পরিধির ভাষা কী বোঝাতে চায় ? পুরুষার্থ, পঞ্চম ? তবে কেন, চেরাজিব নাভিকেন্দ্রে শেকড় ছড়ায়ে অক্ষদ্রাঘিমা বেয়ে হয়ে আছে বংশলতিকা ? ওই আমার বোধিবৃক্ষ। সম্মোহন, বিদ্যার ঘোর। নড়েচড়ে বসতে যেটুকু সময় ওরই মধ্যে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে যায়, ভাববাষ্পে উঠে যায় সুজাতার গহন পৃথিবী। জতুগৃহ পোড়ে। বেজে ওঠে শূন্যতা।

সুব্রত রায়

তৃতীয় চোখ

আমার মাথার ভেতর নির্দিষ্ট দূরত্বে পর পর ধূর্তমানুষেরা
আমার মাথার ভেতর 'ক' প্রান্ত থেকে একজন ব্রাহ্মণ যজমানের বাড়ী থেকে ভেট পাওয়া ছাগলছানা নিয়ে হেঁটে আসে।

ধূর্তমানুষেরা প্রত্যেকে বলে—এটা কুকুর জাতীয় প্রাণী। জাতপাতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। ধর্মীয় ধ্বজাধারী মানুষের এহেন হাল নিয়ে সবাই আশ্চর্য হওয়ার ভাণ করে। উপদেশ দেয় ঐ বস্তুকে পরিত্যাগের।

আমার ব্রাহ্মণ প্রচলিত গল্প-বামুনের মত ত্যাগ করে না ঐ বস্তু।

আমার ব্রাহ্মণ জানে কুকুর ও ছাগলছানায় খুব বেশী তফাৎ নেই। নারায়ণ শিলা

নিয়ে প্রকৃতির ডাকে সে সাড়া দেয় এবং সে ভালভাবেই জানে তার কোন পাপ নেই, পাপ নেই।

খলমানুষেরা অবাক হয়।
তাদের কব্জিতে কোন সময়মাপক যন্ত্র ছিল না।

চিরঞ্জীব সরকার

বিপ্রতীপ

দুয়ার থেকে অনেক দূরে
এখন প্রতিকূল নক্ষত্রে আছি
ঘুমের সজ্ঞাক্রম ভেঙ্গে পড়েছে
অতৃপ্ত জাগরণে কোনও প্রশ্ন কোজাগর
কথা

শুনে যেতে চাই :
যদি খুঁজে পাই এই সংক্ষুব্ধ চরাচরে
শেষতম আলো।

অরুণ সাধুখাঁ

আমাদের সঙ্গী

আমাদের সঙ্গী ঝাঁ ঝাঁ রোদ আর নিষ্ঠুরতা।

পৃথিবীর ভ্রাম্যমান স্বপ্ন আমাদের চোখে, পৈতৃক সম্পত্তি নেই আমাদের হাতে, আমরা মানুষ নামহীন, বয়সের চিহ্ন নেই, জন্মস্থানে স্মৃতির ফলক নেই।

আমাদের মায়ের ঠাকুর ঘরে পাথর দেবতা। ছিলাম পুকুর ঘাটে এঁটো বাসনের স্তূপে, নৌকার গলুইয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতাম নক্ষত্রের নিচে, কামার দোকানে অপেক্ষায় থাকতাম কখন খেলনা পাবো !

ছিলামনা কাঠের বীণায় সোনার অক্ষরে অথবা গ্রীবায়, টিকলিতে।

আমরা এসেছি বার বার, তার স্মৃতি আমাদের স্মৃতিতে বাঁধানো নেই।

পরিত্যক্ত

পরিত্যক্ত পড়ে থাকি স্বপ্নের সমুদ্র চলে যায় মণ্ডে, রক্তাক্ত সন্ধ্যায় নড়ে হৃৎপিণ্ড। আমাদের ঘিরে থাকে সবুজ সমুদ্র, ঢেউ গান গায়, আমরা পাথর জড়ো করি বারান্দায়। হারিকেন জ্বলে, ঠোঁটে বিড়ি, ঘন ঘন চায়ের পেয়ালা আসে ঠোঁটে। শুরু হয় রূপকথা, সমাধির ভাঁজে ভাঁজে লবণাক্ত ফুল। চাঁদ আসে শহরের ঘাম নিয়ে, নারীদের আকাঙ্ক্ষায় জ্বলে তারা, চিত্রকল্পে প্লাবিত জন্মের বিস্তীর্ণ প্রান্তর।

লুপ্ত পথে আমাদের অনুগ্রহ ছুটে চলে, আমাদের আনন্দ বর্শায় গাঁথা, আমাদের তুচ্ছতা বাঁশিতে বাজে, আমাদের অন্তর্গত গোলাপ দলিত।

জহর সেন মজুমদার

শুদ্ধ

হাস্যের ভিতর দিয়ে যে কোনো ঘরের
দোর খুলে যায়। দেখা যায়, সেই দোলনা
সংগ্রামের মধ্যে জয়ী হয়েছে। এই যে
আলো থেকে বর্ণহীন যজ্ঞধূম। পুত্রকন্যার
সম্বন্ধে বেশি কিছু বলবার নেই। শুধু
সর্বলোক যা দিয়েছে তা কুড়িয়ে নিয়ে
শুদ্ধ। আজ শেষ দেখা। তাই ভোরও
সমবেদনায় উত্তীর্ণ। ধ্বনির কোনো ভার নেই

পথ

দেখে এসো, প্রাণ পেয়েছে। তাই এখন আর
ঘরে ফিরবার নাম করে না ; বলে,
পুকুরের নিচে কাদা নেই, পাঁক নেই আছে সবুজ।
পথ আহত হয় এসকল কথা শুনে।
ইন্দ্রিয় যথেষ্ট নয়। তবু চক্ষু কাঁদে।
আর স্পর্শ করে নামহীন এক হাহাকার।
এখনো জড়িয়ে আছে আলোর বৃত্ত ওই অন্তঃপুরে।
আর সৃষ্টি। ক্রমে স্বচ্ছ হয়ে আসে

অজ্ঞাতবাস

ফল্গু বসু

স্বেচ্ছাচারী

জলে একাকার রূপ, সংস্থার অধীন
অবাধ্য শামুক নিঃশব্দে ডুব দিয়ে
ঝাঁকালো জলের গাছ ; তবু জল নড়ল না।
ভবতারিণীর প্রেমে মত্ত রাত্রির উপোসী বন্ধু
ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিয়ে অগত্যা
গাছে তুলে দিল তাঁর নিজের হাতে বানানো নুনের শূন্যকে।

অশোককুমার দত্ত

পুনশ্চ ৩

সবিতা তুই
'ৎ সাবিতি

ছবি জল জল
নির্ণেয় ঋতু
ছলোছলো জল
যেন ভাসে সেতু

পশ্চিমের উই
যদি না কাটে
হিরণ্ময় এই
কল-কব্জাকু

নির্মল হালদার

গান

মায়ের কাছে কোনো সন্তান গানের কলি নয়
সম্পূর্ণ একটি গান
মা সারাদিন একটি সম্পূর্ণ গানের পরিচর্যা করে
স্নান করায় আদর করে দুধের জন্য ভাতের জন্য ডাকে
সারাদিন মা একটি গান বাঁধতে থাকে রান্না করতে করতে
চুল বাঁধতে বাঁধতে
গানে ভুল হলেই চড়-চাপড়, বকুনি, তারপর
মায়ের মন খারাপও হয়, মা আর খুঁজে পায়না গান
হঠাৎই হাওয়ার সঙ্গে ঘরের মধ্যে এসে পড়ে একটি পাতা
চিকন, সবুজ—
মা ধরতে যাবে যেই মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে
সম্পূর্ণ একটি গান

রণজিৎ দাশ

জলসাঘর

অজ্ঞাত মহাজাগতিক রশ্মিবিকিরণে ধ্বংস হয়ে গেছে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণ। মৃত্যুর মহাস্তব্ধতা বিরাজ করছে বিশ্বচরাচর জুড়ে। হঠাৎ পৃথিবীর একপ্রান্তে শোনা গেল ক্ষীণ টুং-টাং শব্দ। একটি কৃত্রিম-প্রজনন গবেষণাগারের সংগ্রহ-কক্ষে মুখোমুখি রাখা দুটি ফ্রিজ। একটিতে সারি সারি কাচের টিউবে সংরক্ষিত ডিম্বাণু, অন্যটিতে শুক্রকীট। নিঃসাড়, জনশূন্য সেই কক্ষের ভিতর কাচের টিউবগুলি আপনা থেকে নড়তে শুরু করেছে। ক্রমে অস্থির, আরো অস্থির, যেন মরিয়া হয়ে তারা ফ্রিজের দরজা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে পরস্পরের দিকে। মৃতগ্রহের নৈঃশব্দ্যকে স্তম্ভিত ক'রে, গর্জনের মতো ক্রমশ বেড়ে উঠছে সেই অশান্ত ঝন ঝন শব্দ।

আবহবার্তা

অরুন্ধতী উপগ্রহ থেকে খবর পাঠাচ্ছি যে ৩৪ নং মেঘ বিস্ফোরিত হবে সন্ন্যাসিনী-দের মঠের ওপর, ঠিক মধ্যরাতে। যে ঘোর বৃষ্টি নামবে তার নৈতিক চরিত্র আধোঘুমন্ত গ্রামবাসিকার। অস্পষ্ট ঘোড়া, সবুজ পলায়ন পথ এবং গোলাঘরের অন্ধকার নেমে আসবে। নানারূপ নিষ্পাপ কিন্তু অবৈধ বজ্রপাতের সম্ভাবনা। সেগুন কাঠের ফাটল দিয়ে প্রাচীন পর্তুগীজ মঠ তৃষ্ণার্ত নিঃশ্বাস ফেলবে অবাধ শস্যক্ষেতের ওপর। দানার ভিতরে জমে উঠবে দুধ। যে লজ্জা পাবে তার শরীরে গম-ভাঙানোর গন্ধ। যে ভয় পাবে তার শরীরে জিপসিবাহুর ছায়া। একটি নীল জলজ রশ্মি ধরে ঈশ্বর স্বয়ং নেমে আসবেন মঠাধ্যক্ষার শয়নঘরে। রেলদিশারি লণ্ঠন হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে খালাসির বৌ, ভেঙ্গে-পড়া ব্রিজের মাথায়। ঝড়-জলের ভিতর, বিদ্যুচ্চমকে ঝলসে উঠবে এক প্রসন্ন বুড়োচাষীর বিশ্ব।
অরুন্ধতী উপগ্রহ থেকে খবর পাঠাচ্ছি যে সন্ন্যাসিনীদের মঠ বিস্ফোরিত হবে ৩৪ নং মেঘের ওপর, ঠিক মধ্যরাতে। যে ঘোর বৃষ্টি নামবে তার নৈতিক চরিত্র দ্বিধাগ্রস্ত মঠাধ্যক্ষার…

অরুণেশ ঘোষ

কুন্তী

পুত্রের সামনে এসে ব্যভিচার বলতে হয়, হবে
এ কোন লজ্জা ও দুঃখের নয়—যা ছিল প্রথমে
আজ বেঁচে থাকতে হয় বিদুরের কাছে এসে—ইদু'রী শরীর

নিয়ে নিঃশব্দেই, সেই রূপ—যা দেখে লোভী সূর্য
উঠে এসেছিল সমুদ্রের অতলান্ত থেকে—মৃত আজ
ঝুলে আছে সপ্তপর্ণী শাখা থেকে, নগ্ন, লম্বমান

কোন সন্তানকে পরিত্যাগ করতে হবে আর কাকে নয়
জেনে গেছে, কতদিন আগে, সবই তো জারজপুত্র হবে
আর ধীর পায়ে কুন্তী এসে দাঁড়াবে উঠোনে আমার, ভিক্ষা যা

চাওয়ার আছে চেয়ে নেবে দুঃস্বপ্নতাড়িত রোগগ্রস্ত…
যে রোগ মা-ই তার গর্ভে থেকে বুনে দিয়ে প্রসব করেছে
তবু কেউ দায়ী নয়, সূর্য নয়, কুন্তী নয় দায়ী স্বপ্ন নিজে

দ্রৌপদী

মৃতের সামনে এসে যুধিষ্ঠির দাঁড়ালো সসঙ্কোচে
বলে উঠল, পাপ ছিল, পরে উঠে গেল পথ ধরে
কিছু নয়, নেহাতই স্ত্রীলোক এক মরে পড়ে আছে

সব শহরেরই একদিকে, ঠিক, থাকে ক্লান্ত দুঃস্থ নদী
আর বস্তিগুলো পূতিগন্ধময় অতিক্রম করে যেতে
হয় সেই দিকে, অন্য একটি মেয়ে বলল, এ পথেই

স্বর্গে তারা গেছে, দ্রৌপদীর মৃতদেহ চিৎ হয়ে, খোলা
চোখ আকাশের দিকে তুলে এখনো এখানে—শহরের শেষে
পর্বতের ওপর থেকে আজ এত ধীর ও নিঃশব্দ সন্ধ্যা নামে

'কত পুরুষকে আমি ভালবাসতে পারি, বলো' একবার জ্বলে
উঠেছিল, তারও পরে সব পুরুষকে সে মুখ বুঁজে স'য়ে গেছে
শেষে দেখা হল আমাদের, মহাপ্রস্থানের আগে, শান্ত শ্মশানে

বিভীষণ

নিজের হৃদ্‌পিণ্ডকে সে সান্ত্বনা দিতে পারে
সে সময়, যখন পুরানো থালায় ক'খানা মাত্র রুটি
আর ব্যঞ্জন নিয়ে বসেছে সারাদিন পর স্নান

সেরে, এ তার দারিদ্র্য নয়, কৃচ্ছ্রসাধন, 'আমি সৎ'
বুকের রোমের দিকে—যার দু-একটি সাদা সেই
দিকে চোখ রেখে বলতে পারে, তবু কেন ভয়, দ্বিধা…!

আগামী দিনের জয়ী যারা, সেতো এসেছে তাদের কাছেই
আগাম খবর নিয়ে, গুপ্তকথা জানাতে জানাতে তার
মুখ কালো হয়ে বিষাদে বিষণ্ণতায় নীচে ঝুঁকে পড়ে

তখনই সে জেগে ওঠে, জানে অর্থহীন, জানে জয় শেষে
তার নাম মুছে যাবে কিংবা সে নাম কুৎসিত অক্ষরে
ইতরজনের মুখে মুখে ঘুরে যাবে শুধু, জানে তার তাই

প্রাপ্য, ভাই, পুত্র, বন্ধু ও স্ত্রীর মৃত শরীর ও রক্তস্রোতের
মধ্যে দিয়ে হেঁটে গিয়ে, তার সাথে দেখা হল ধোঁয়ায়
আচ্ছন্ন নোংরা গলিতে এসে, যে মানুষের কাছ থেকে

চলে গিয়েছিল ঘৃণাভরে, অপ্রাকৃতের কাছ থেকে কি
পেয়েছে—জানতে চাই, হেসে, হাতের মদের গ্লাস আর
আঙুলে দেখায় তার রোগা পাগলাটে চোখ সেই স্ত্রীকে···

জীবন স্বপ্ন

এক ভোরবেলা শহর আমাকে কাছে পেয়ে বলল
তুমি ভাবো আমি শুধু স্বপ্ন দেখি ধ্বংসের, মৃত্যু
নয় আমি হতে চাই নীচু ও সরল, দ্যাখো মেঘ চলল

আমারই গর্ভের ভিতর দিয়ে ধোঁয়ার সাথে মিশে
মৃত গ্রাম থেকে আমি এসেছি, পোড়া শহরে
কিছুদিন কাটাবো, পিঁপড়ে বলল, জুতোয়া পিষে

ফেলছে আমাকে কিন্তু তুমি তো যাবে আমার
চেয়েও আরও ছোট জীবাণুর কাছে—যা অদৃশ্য
উপজাতিরা বলল, বর্জন করেছি অরণ্য আর কুঠার

এত জীবন দেখে অস্থির হয়ে ওঠে নক্ষত্র, ওরা কেউ
আমাকে দেখে না, শুধু তুমি, কোন স্ত্রীলোকও না
খুব একটা দূরে যাবো না আমিও, সেজন্য স্বপ্নই

আমার ক্ষত, ক্ষতই স্বপ্ন, ক্ষতের লালাভ
নক্ষত্রও স্তব্ধ হয়ে দ্যাখে, আজ দৃষ্টি বিনিময়
হল দূর ভবিষ্যতের জলন্ত দুই চোখের সাথে ফের

ফের তাকিয়ে দেখলাম পেছনের নিঃশব্দ হাস্যরোল
হা-মুখগুলো শুধু দেখা যায়, কোন শব্দই আসে না
আর এক হিমযুগে পশুর চামড়া তুলে নিয়েছি গায়ে

আজ তা অসহ্য, খুলে ফেলেছি মরুভূমির পাশে এসে
লজ্জা নিজেকে নয়, লজ্জা হয় লিঙ্গাকৃতি পাথরকে
যার সাথে সহবাস সেরে সার বেঁধে মেয়েরা নেমে যাচ্ছে জলে···

মিশ্রণ

এই শীত ও কুৎসিত কুয়াশার কাঁপুনির মধ্যে
বেরিয়ে এসেছে কিছু লাল পিঁপড়ে, রক্তমাখা
কিছু সাদা পালক বয়ে নিয়ে চলেছে তারা
প্রচণ্ড আবেগে অথচ এসময় তো তাদের—নীচে
মাটির উষ্ণ গহ্বরে ঘুমিয়ে থাকার কথা, কেন
এই সময়ে তারা এখানে আর এই পাখির মাথা
ধড় থেকে বিচ্ছিন্ন করেছি আমি, হাত ধুয়ে
এসেছি সামনের সোঁতায়, তাহলে খিদেই সেই
ভোঁতা যন্ত্রণা পিঁপড়ে যা জানে আর আমি তা
স্বীকার করতে চাইনা, কথা বলতে পারিনা সেইসব
বন্ধু ও স্বজনের সাথে বিপদ থেকে যারা বাঁচিয়েছে
চোখের রক্ত মুছিয়ে জিভে লাগিয়ে দিয়েছে
মধু ও সোহাগা, অনেক দূরে চলে গিয়ে ছিলাম
আমি, সেখান থেকে শিখে এসেছি ম্যাজিক—এক
মিশ্রণের যাদু, গর্ভবতীর সাথে চিমনির ধোঁয়া আর
মৃগীরুগীর সাথে মধ্যআকাশ, স্বপ্নের সাথে আগুন
ক্ষুধা ও পিপাসার সাথে পাথর কুচির ফেনা
প্রথমে যে বিশ্বাস করে আমাকে, কিছুদিন
করে, কাছে আসে, পরে একরাত্রি থেকে শুরু
হয় তার ঘৃণা—উগ্‌রে দেয়, এইতো পাওয়া !

সকাল

যে কোন ঋতুর তুমি হতে পারো, যে কোন রাত্রির পর
সারারাত ধরে গোঙানি অথবা রহস্যময় নাচ
আজ দেখি ছড়িয়ে পড়ছে সমস্ত দুর্দশার ওপর

অজ্ঞাতবাস

সকালবেলার আলো, স্বস্তি ছিল, যখন ঢাকা
ছিল গোটা শহর অন্ধকারে, এখন ভয়াবহ ও বিকট
যাই ঘটুকনা কেন, জন্ম থেকে পেয়েছি সহ্য করার ক্ষমতা

এই সকালে আমাকে হাঁটতে হবে কোন দূর শৈশব অবধি
খাবারের দোকান থেকে ঝুপড়ি, ঝুপড়ি থেকে আবার
পথ, কাল রাতেই এই ঝুপড়ির মেয়ের কাছে অতিথি

হয়ে এসেছি এক অসম্ভব কালো মুখ, ওগো সকাল
আনন্দে বেদনায় অধীর হয়ে ওঠার কথা ছিল বুঝি
একে অন্যকে স্পর্শ করে চুপ, আজ মাথা ঝুঁকে পড়ে আমার···

শস্যখেত

আজ পেরিয়ে গেলাম তোমাকে কারণ
তুমি নিরর্থ, তোমার সৌন্দর্য আমার খিদে
বাড়িয়ে তোলে শুধু, আমিও আরেক ফসল

যার কাছে মাটি ঘৃণ্য, প্রকৃতিও শূন্য ও শেষ
যাকে পান করতে দিয়েছে পোড়া মবিলের
সাথে মিশিয়ে মদ, স্নায়ুর কুণ্ডলী আমার দেশ

আমিও ঘুমন্ত স্ত্রীলোকের পাশে দাঁড়িয়ে
জিগ্যেস করেছি নিজেকে, বল্ বেছে নিবি কোন পথ ?
যত ক্ষত আছে আমার, সবই পারি সারিয়ে তুলতে

শুধু একটি হা-মুখ জলন্ত থেকে যায় চিরন্তন
ওসব নিয়ে কোন ভাবনা নয় আর—তুচ্ছ
চিরকুমারের কোন গর্ব নেই, কাগজ কুড়িয়ে জ্বালিয়ে নেয়

আগুন—ভোররাতে পথে বেরিয়ে এসে লম্পট
তোমাকে যে ছেড়ে যাচ্ছি শস্যখেত, কোন মুগ্ধতা
নেই আমার, কোন ক্ষোভ দ্যাখো আমার শকট

কোন চাকা নেই এর, কোন টান, তবু সে চলে
আমি আশা করি না আরও কোন ফসলের মাঠ—নাহ্
মাঠের শেষে যে কুয়াশা সেই আমার হয়ে কিছু বলে উঠবে···

পার্থপ্রিয় বসু

উপহার

তোমাকে সাগরের মতো যতই উপচে দিতে চাইছি ঢেউ, তুমি তীরভূমি হয়ে ফিরিয়ে দিচ্ছো সব। দুধসাদা ফেনার সুন্দর, নিকষ নীল জলের অতল, এমনকি মণিময় ঝিনুক, টেট্রা মাছের রং, প্রবালের সাদা কিছুই তোমাকে টানে না। তুমি বলো, এসব সুন্দরের পেছনে রয়ে গেছে মেধাবী অনুসারী কিছু হাঙরের দাঁত, পিরানহা, তিমি আর জলজ কেউটে। আমি বালসার ভেলা থেকে নবীন জাহাজ ভাসিয়েছি একে একে জলের শরীরে। তুমি বেপরোয়া সুনেমিস্, তেতাল্লিশের ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস আর কিছু ডুবো পাহাড়ের কথা ভাবো মনে মনে। বোধহয় একটা ভুল রয়ে গেছে। আমাদের জলের জীবনে আমিও কখনো নিরাপত্তা খুঁজিনি দুহাতে; এমনকি আপাত কিম্বা আপেক্ষিক বোধেও। শুধু মেরু পর্যন্ত যাওয়ার সাহস, গোপন পিস্তল, রয়েছে আমার। যে সাহসে অভিযাত্রী হওয়া যায় এক ফুঁয়ে রিজার্ভ ভেঙে, যে সাহসে একলাফে চোখ বুঁজে অতল ক্রিভাসে পার হই, ছোট্ট কায়াকে বসে বিপুল তিমির পিঠে ছুঁড়ে দিই তীব্র হারপুন, তেমন অসীমকেই ছোট্ট বৈঠা করে উপহার দিয়েছি তোমায়।

ধূসর সমাধি

গোলাপি শাড়ীতেই তাকে মানায় খুব,
তবু সে ধূসর গেরুয়া পরে আসে।
জলপাইসবুজ তার চোখে ভূমধ্যসাগর ঢেউ খেলে,
তাই সে কখনো চেয়ে নীলিমা দেখেনা।
তর্জনী মধ্যমায় তার রুদ্রবীণা বাজে,
তারের কাঁপন সে আঙুলে তোলে না।
তার শ্বাসে নাগকেশরের মৃদু গন্ধ,
সে কখনো অনুভূত বাতাসের কাছেই যায় না।
এমনি করেই সে অনুভূতি থেকে দূর
সমস্ত রঙিনের বিপরীত মেরুতে বাস করে।
নিটোল শরীরে নেয় রোদের বর্ণালি,
বাদামী ফোস্কা পড়ে ত্বকে।

অজ্ঞাতবাস

সে নগ্ন পায়ে পার হয় অনন্ত ধূসর,
কাঁটাকে রক্ত দেয় জ্বালানি ফুড়োতে।
এমনি করেই সে বালি ও পাথরে
মিশরীয় সৌধ হয়ে ওঠে,
আমি সেই রমণীর রুক্ষ সমাধিতে
একটি গোলাপ রাখি রোজ।

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

পর্যটন

কবে যেন তুমি পর্যটনে গিয়েছিলে সমুদ্র দীঘায়
আজো তোমার নিঃশ্বাসে তার আর্তনুন রয়ে গেছে
তলে তলে রুদ্ধশ্বাস ঝাউবন
তুমি হেমন্তের বেলা নিচু হয়ে ছড়িয়ে পড়েছ ভূমণ্ডলে
শিশিরে জড়িত চুলগুলি উপমাবিহীন সাদা বিছানায়
তুমি ঝাউবনে লুকিয়ে পড়েছ···
'খুন হয়ে গেলে' বলে আমরা হোটেলবাসী
টর্চ হাতে বেরিয়ে পড়েছি
তুমি জানো পর্যটনে মজা আছে
সেবার পুরীতে গিয়ে তুমুল ফুচকা খেয়ে
বাহবা পেয়েছ খুব
আর পর্যটনে লাভ হোলো আমারো অনেক
দেখলুম ভেঙে পড়া তোমার পাহাড়
সূর্যাস্তের প্রায় কাছে চলে গেছে
কার ব্লাউজের সাদা নিয়ে খেলা করে পাহাড়ের নীচু মাথা

আজ কতো দ্রুত সন্ধ্যা নেমে এল
সন্ধ্যা নেমে এলো আমাদের ঘিরে।

দূরত্ব

দূরে দূরে একটা পাহাড় খণ্ড, আরেক পাহাড় খণ্ড, ভীত নীলিমায়—
দূরত্ব রয়েছে, তাই যেন ঘন হয়ে আছে,
নাহলে একটা থেকে আরেকটায় সমস্ত দিন হেঁটে যেতে হয়।
এ পাহাড়ের ঘষা বিকেলের চাঁদ, ও পাহাড়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে সন্ধের পরেই
এ কোনো বদল নয়, দৃষ্টিবিভ্রমে ঝরেছে চাঁদ বুকের নিকটে।

আমাকে দুধের বাটি দিয়েছে লোকেরা—বহুদিন পরে গেছি গ্রামে
সেখানে ছিল না ঈর্ষার নীল।

মনে হয় আমরা সকলে প্রাকৃতিক পাহাড়ের চূড়া
ক্রমে কাছে গেলে ফুটে ওঠে আমাদের অন্তর্গত দূরত্ব জ্যোৎস্না, বাঁক।
আমি দূর থেকে দেখে ভেজাবো চোখের পাতা—
আর শান্ত ফটোগ্রাফ বুকে নিয়ে সরে যাব।
ঘোর জঙ্গলের মধ্যে আমি হারিয়ে ফেলবো বাড়ি ফিরবার পথ,
দেখবো দূরের থেকে, ব্যবধান পার হয়ে কেমন পাহাড়চূড়া
ঢলে পড়ে এ ওর শরীরে।

রাখাল

বাঁশি তার হাতে ছিল আড়বাঁশি—
একা অন্ধকার রাতে বাজাতো আশ্চর্য সুর
দুঃখ তার অপরিসীম একলা গাছ যেন শব্দ করে রাতে
ধানমাঠে গোত্তা খাওয়া ঘুড়ির মতো তার ম্লান বাঁচা
তবু বহু সাপ বুকে দুলে উঠেছিল
শরীর শরীরময় তার দিন রাত বাঁচা
পাথর হোঁচট খেলে তার মনে পড়তো
গাঁয়ের বুড়িরা তাকে নিষেধ করেছিল মাঠে যেতে
অর্থহীন বাঁশি তার বেজে ওঠে মাঠে
তার শ্রোতা নেই যেন সে জলপ্রপাত—
ঝরে পড়েছিল পাহাড়ের থেকে পাহাড়ের দিকে।

অজ্ঞাতবাস

সেই রাখাল বালক, সাদা একটি গরুর পিঠে
ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে
ওকে জাগিয়ো না
ওর নিজস্ব দিনবসান ওকে ডেকে নেবে
স্বনির্ভর কোন অর্থময় দিনের আধারে।

মা

জন্মেছিলাম একদিন জন্ম হয়েছিল বলে
শীতরাত অঘ্রাণের প্রচণ্ড হিমানী চারিদিকে –
কতদূরে আমাদের বীরভূম! কতদূরে আমাদের ময়ূরাক্ষী আজ
কতদূর চলে যায় ওরা সন্ধ্যার গড়ানে।
কতদূর আজ আমার মা—ব্যক্তিগত স্নানঘর।
রহস্যময় আঁধার পার হয়ে তুমি কি বিড়ালী হয়ে
আসবে আমার কাছে?
জন্মেছিলাম একদিন শুধু জন্ম হয়ে ছিল বলে!

শ্রদ্ধেয় অরুণবাবু,

অজ্ঞাতবাস সংকলন-২০ নিঃসন্দেহে আমার কবিতা পাঠের অভিজ্ঞতাকে আরো বিস্তৃত করেছে।...প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধটির জন্য সাধুবাদ। যদিও লেখকের সঙ্গে আমি একমত নই, তবু এই অত্যন্ত সুলিখিত ও টানটান প্রবন্ধটিকে অবহেলা করাও অসম্ভব।

হেডকোয়ার্টারে আঘাত হানতে চেয়েছেন প্রসূন। চারপাশের আর্থ-সামাজিক অবস্থাকে তলিয়ে না দেখে, এ ধরনের কামান দাগানো এর আগেও বিস্তর হয়েছে। পঞ্চাশ, ষাট কি সত্তরের তরুণতুর্কীরা এমন শিল্পযুদ্ধে একাধিকবার সামিল হয়েছিল। সেই সমস্ত যুদ্ধের ফলাফল শেষপর্যন্ত শূন্য—শূন্য থেকে গিয়েছে। তথাকথিত প্রতিষ্ঠান প্রতিবারই মাড়ি বার করে হেসেছে এবং ইনি-উনি এধারে ওধারে সটকে পড়েছেন। কারণ 'প্রতিষ্ঠানে'র ঘাড়ে কটা মাথা সেটা না বুঝলে 'লড়াই' কথাটা' অচিরেই হাস্যকর ব্যায়ামে পরিণত হয়।

লেখকের হাতে যখন কলম থাকে না, তখন কি তিনি প্রতিষ্ঠানবিরোধী নন? আমি জানি না এরকম পার্টটাইম বিরোধিতা হয় কি না। যদি না হয়ে থাকে তাহলে লেখকের কবিতা, আচরণ, কর্মক্ষেত্র, সংসার ও সমাজ সমস্ত ক্ষেত্রেই এই বিরোধিতা ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য। এবং এইভাবে ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন কবি আর শুধুমাত্র কবি থাকেন না—একজন প্রতিবাদী মানুষে পরিণত হয়ে যান। যেমন ছিলেন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু প্রসূন যখন সন্দীপনের প্রসঙ্গ টেনে আনেন তখনই পুরাতন-ঘরানার ভাববাদী শিল্পযুদ্ধের ধোঁয়ায় নিজেকে আচ্ছন্ন করে তোলেন।

প্রসূন চেয়েছেন, সংবাদপত্রের হাত থেকে সাহিত্যের দাদাগিরি ছিনিয়ে নিতে এবং সেইসঙ্গে কবি ও কবিতার স্বাধীন সত্তা বিষয়েও তিনি গর্বিত বোধ করেছেন। বৃহত্তর পটভূমিকায় বিচার করলে প্রসূনের এই অভীপ্সা ও গর্বের বাস্তব পরিপ্রেক্ষিত খুঁজে পাওয়া শক্ত। কারণ আমাদের দেশের চালু কাঠামোর মধ্যে সাহিত্য জিনিষটিও পণ্য বিশেষে পরিণত হয়েছে। 'কোয়ালিটি কিলিং' এই

পরিণতির একটি অবশ্যম্ভাবী ফলমাত্র। বোধহয় এ ধরনের চিন্তা অনেকাংশেই ভুল, যে কাঠামোটিকে আঘাত না করে শুধুমাত্র দাদাগিরি অন্যত্র সরিয়ে দিতে পারলেই যাবতীয় মুসকিল আসান হয়ে যাবে। তবুও আমরা এই চিন্তার দ্বারস্থ হই। কারণ নিরেট ও বিশাল সমাজকাঠামো এবং তার প্রভুদের অপার ঐশ্বর্যের সামনে ব্যক্তিবিশেষ থ হয়ে যায় কিন্তু নিজের রাগটাকে অস্বীকার করতে পারে না। সেই হিসেবে কৃষ্ণ প্রসূনকে মেনে নেওয়া অনেক সহজ হত যদি তিনি সাহিত্য-ব্যবসায়ের প্রতি আক্রমণটিকে সাম্প্রতিক আর্থসামাজিক পটভূমিকায় বিচার করে দেখতে সমর্থ হতেন। কিন্তু তার বদলে বিভূতিভূষণের প্রসঙ্গ টেনে—প্রকাশকদের প্রতি তাঁর আস্থা জ্ঞাপন এককথায় আমাদের হতবাক করে দেয়।

একইভাবে 'কোয়ালিটি কিলিং'-এর আওতা থেকে কবিতার স্বাধীন বেড়ে ওঠার কারণটিও এই সমাজকাঠামোর মধ্যেই সম্পৃক্ত রয়েছে। প্রসূন বলেছেন, 'তাদের (গদ্যকারদের) লেখার আকার, যা কবিদের চেয়ে অনেকবেশি ফর্মা দাবী করে। এই অর্থনৈতিক সুযোগটুকুকে কাজে লাগিয়ে প্রতিষ্ঠান তার নিরেট অপব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।' তাহলে সেই 'প্রতিষ্ঠানে'র রাহুগ্রাস থেকে নাট্যসাহিত্য নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারল কি ভাবে? গদ্যকারদের থেকেও নাট্যকারদের অনেক বেশি জায়গা চাই তবু প্রসূনের এই 'নিরেট অপব্যবসার' গিলোটিনে তারা মাথা পেতে দিল না কেন? তার কারণ এইটাই যে এই নাট্যসাহিত্য নিয়ে তথাকথিত এস্টাবলিশমেন্টের কোন ব্যবসাবৃত্তির সুযোগ ছিল না। সুযোগ অর্থে ব্যবসায়িক চাহিদা এবং যোগানের কথা বোঝাতে চাইছি। সেই সুযোগ কবিতা নিয়েও নেই, অন্তত ব্যাপকভাবে নেই। তবু কবিতাকে ওরা ঠিকই প্রয়োজন মত ব্যবহার করছেন। যাঁরা ব্যবহৃত হচ্ছেন না তাঁদের অভিমান থাকতে পারে কিন্তু বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের মতো কোন প্রতিষ্ঠান বিরোধী ভূমিকা নেই। প্রতিষ্ঠানেরর বাইরে ও ভেতরে প্রকাশিত কবিতার মধ্যে যখন কোন চরিত্রগত পার্থক্য স্পষ্ট নয়—তখন প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায় কথা সাধারণ অভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়। সুভাষ ঘোষ বা সুবিমল মিশ্র যেমন প্রতিষ্ঠানের বাইরে গদ্যসাহিত্যের আলাদা চেহারা তৈরি করেছেন তেমন অব্যবসায়িক গঠনশৈলি ছাড়া কোন বিরোধিতাই প্রামাণ্য হয়ে ওঠে না।...নমস্কারান্তে।

—প্রিতম মুখোপাধ্যায়

লেখকের বক্তব্য

আজ ভোরে ছিঁড়ে ফেলি সংবাদপত্রের ঘোর ছায়া'—সম্ভবত এই নামে আমার লেখাটি বর্তমান পত্রিকাটিতে প্রকাশিত হয়েছিলো আড়াই বছরেরও বেশী আগে। তারপর জল, নির্ধারিত পথে, অনেকদূরই গড়িয়েছে। যুগপৎ প্রশংসা ও ধিক্কার-

মূলক চিঠি ও মৌখিকবার্তা লেখাটি বেরুনোর পরপরই অনেকগুলি পেয়েছিলুম। তখন সেগুলির উত্তর দেওয়ার দরকার মনে করিনি প্রধানত এইকারণে যে আমি জানতুম খুব অনতিবিলম্বেই পরবর্তী ঘটনাবলী থেকে এইসব উত্তরগুলি পাওয়া যাবে। তারপর খুব প্রত্যাশিত পথেই প্রতিআক্রমণ নেমে আসতে থাকে ও সংশ্লিষ্ট মহলে সৃষ্টি হতে থাকে আলোড়ন। আর আজ, এইমুহূর্তে, প্রতিষ্ঠান ও বাংলা-ভাষার প্রধান লেখকদের অর্থাৎ যাঁরা প্রতিষ্ঠানের হয়ে কলম ধরেন না তাঁদের সম্পর্কের চিত্রটি অনেকাংশে জটিলতামুক্ত। আজ এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রিতম মুখোপাধ্যায়ের চিঠিটি, যেটি সম্পাদক সঙ্গতকারণেই ছাপতে মনস্থ করেছেন, সেটির উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

প্রতিষ্ঠানের টিকে থাকা মূলত তিনটি জিনিষের ওপর নির্ভর করে (১) বিবেক-বেচা ধান্দাবাজী (২) ভাববাদী নিষ্ক্রিয়তা ও (৩) অতিবিপ্লবী উন্মাদনা। প্রিতম এই তৃতীয় দায়িত্বটিকে সজোরে তুলে নেওয়ার জন্য তাঁর প্রশস্ত কাঁধ বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে তাঁকে ধন্যবাদ কারণ এর দ্বারা তিনি একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তাকে পূর্ণ করেছেন। প্রথমোক্ত দুটি শিরোনামের তলাতেও আমি এক্ষুণি কিছু নাম বসিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সেটা হয়ে যাবে গায়ে পড়ে বাড়াবাড়ি করা। আর আমার বন্ধুরা অনেকদিন থেকেই আমাকে একটু শান্ত, উদাস ও নরমভাষী হওয়ার সুপরামর্শ দিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের কথা শুনে দেখি কি হয়!

কিন্তু প্রিতম মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ কারণ তার চিঠিটিকে আমরা ভবিষ্যতে ব্যবহার করতে পারব বিরোধিতার যুদ্ধে কি কি দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে তার অন্যতম উদাহরণ হিসেবে। এই সেই মনোভাব, আমি জোর দিচ্ছি, এই সেই মনোভাব যা যে কোনো বিরোধিতার যুদ্ধকে পেছন থেকে ছুরি মারে। এক বিপ্লবী সামগ্রিকতার ধুয়ো তুলে এরা 'একটি বিরোধী কার্যকলাপ' সম্পর্কে সন্দেহের বাতাবরণ সৃষ্টি করে। তুমি তোমার বিধবা মাকে মুড়োর কাঁটা দিয়ে ডালটাই খাওয়াতে পারলে না ফলে কারখানায় শ্রমিকদের মজুরিবৃদ্ধির আন্দোলন করে তুমি আর কি করবে! তাছাড়া উনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেনই না। কিকরে জানলেন আমার কবিতা, আচরণ, কর্মক্ষেত্র, সংসার, সমাজে আমার বিরোধিতা ছড়িয়ে নেই এবং এর সর্বস্বত্ত্ব একমাত্র বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সংরক্ষিত? আমি সন্দীপনকে, বিনয়উৎপলশঙ্খ ইত্যাদিদের সঙ্গে, টেনেছিলাম এই প্রসঙ্গে, যে, ওঁর সম্পর্কে আমাদের আজ যা ধারণা দশবছর আগেও ত ছিলোনা। এটা আমি এখনও অস্বীকার করিনা। আমাদের যা ধারণা ছিলো তার থেকে তাঁর প্রতিবাদ করা উচিত ছিলো কারণ মানুষ যেকোনো অবস্থান থেকেই প্রতিবাদ করতে পারে। বিরোধিতা করার জন্য কোনো অনুমোদিত বিপ্লববিপণির রশিদ দেখাতেই হবে প্রিতম যেটা চাইছেন তার দ্বারা তিনি বিরো-

ধিতার অবকাশকে সংক্ষিপ্ত করতে চাইছেন তথা প্রতিষ্ঠানের রথপথকে নিরুপল-বিক্ষত করতে চাইছেন যেটা তাঁর মূল উদ্দেশ্য। আমার কথাগুলি বৃঢ় হয়ে গেলোনা তো ?

আর্থসামাজিক অবস্থা। হ্যাঁ ইদানীং এটি খুবই চালু হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই। এটি এমন একটি ঘাট যেখানে বিপ্লবী ও প্রতিবিপ্লবী, প্রগতিশীল ও প্রতিক্রিয়াশীল একইসাথে এমন নির্বিঘ্নে জলপান করে যাচ্ছে যে এটি খুবই সন্দেহের ঊর্ধ্বে একটি পরিভাষা। এটিকে লাগসই করে ছুঁড়ে মারতে পারলে, অভিজ্ঞতা দিয়ে প্রিতম দেখেছেন, অনেক জোরালো লেখাকেই ধসিয়ে দেওয়া গেছে। এক্ষেত্রেও তিনি সেই চেষ্টাই একবার করে দেখতে চেয়েছিলেন। আসলে ব্যাপারটা কি ? আমার লেখাটির বক্তব্য ছিল আনন্দবাজার নামের একটি প্রতিষ্ঠান বাংলাসাহিত্যকে ক্রমেক্রমে শেষ করে দিচ্ছে। এই চক্রান্ত কতটা বিস্তৃত ও কিভাবে এটা সাধ্য হচ্ছে সেটাও ছিলো আমার আলোচ্য আর ছিলো এব্যাপারে লেখক ও সংশ্লিষ্টরা কি করতে পারেন তার সম্পর্কে কিছু ইঙ্গিত। হ্যাঁ, যে ভাঙা রেকর্ডটি আমি বাজাইনি তা হলো—এই ছোটো প্রতিষ্ঠানটি আসলে সর্বভারতীয় শোষণ প্রতিষ্ঠানেরই একটি ব্রাঞ্চ, এইসব ব্রাঞ্চ অফিসের মধ্যে দিয়েই কায়েমী স্বার্থ তাদের বৃহত্তর স্বার্থ কায়েম রাখে, সাহিত্য যাতে বুর্জোয়া অস্তিত্বের প্রতি প্রকৃত আঘাতদায়ী না হতে পারে সেই দিকটাই এরা দেখাশোনা করে, এদের আলাদা করে উচ্ছেদ করা যায় না। এর জন্য চাই তন্ত্রটির উচ্ছেদ, ফলে এর জন্য চাই কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা, গুজরাট থেকে নাগাল্যাণ্ড পর্যন্ত একটি সম্পূর্ণ বিপ্লব। কিন্তু কাজ সেখানেই শেষ হবেনা। কারণ এর পরও থেকে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক শোষণ চক্রগুলি, সুতরাং একমাত্র বিশ্ববিপ্লব সমাধা করে তবেই আমরা আনন্দবাজারের প্রকৃত ধ্বংসস্তূপের ওপর বিজয়োৎসব পালন করতে পারব,···তাই আনন্দবাজার বড় কথা নয় বিশ্ব-বিপ্লবের জন্যই আমাদের কবিতায়, আচরণে, কর্মক্ষেত্রে, সংসারে, সমাজে প্রস্তুত হতে হবে—এই রেকর্ডটি আমি বাজাইনি কারণ রেকর্ডটি সত্য। আর যা সত্য তাকে বারেবারে উচ্চারণ করতে নেই কারণ উচ্চারিত অর্ধসত্যগুলির তলা দিয়ে তা সর্বদাই প্রবাহিত হয়ে যেতে থাকে। আর বারবার উচ্চারিত হলে তার গুরুত্ব সম্পর্কে আস্থাহানি ঘটে। সাধারণ মানুষ সবসময়ে ছোটো করে ভাবে, ছোটো করে বলে, একটা করে নুড়ি ডিঙিয়ে নেমে যেতে চায় নদীটিতে। 'একটা সমস্যার একটা বাস্তব বিকল্প' খোঁজে, এইভাবেই সৃষ্টি হয় সামগ্রিকতার। বিপ্লবী সামগ্রিকতার। অফিসের টিফিন টাইমে কলাপাউরুটী খেতে খেতে আলোচনা করে হয়না। প্রতিষ্ঠান এই বাস্তব বিকল্পকেই ভয় পায়, বিশ্ববিপ্লবকে পায়না। তাই এই ভয় যখনই তাদের ঘিরে ধরে তখন তারা বিপ্লবী সামগ্রিকতার ধোঁয়াশা ছড়িয়ে দেয় সুকৌশলে এবং তাতে হাওয়া দেওয়ার জন্য প্রিতম মুখোপাধ্যায়ের মতো কিছু ব্যক্তিও মিলেই যায়, যেটা আবার প্রমাণ করলেন প্রিতম মুখোপাধ্যায় স্বয়ং।

প্রতিষ্ঠানের ঘাড়ে যটাই মাথা থাকুক ভাই আমরা একটা একটা করেই কাটতে কাটতে যাবো। অবশ্য মাথার নির্ভুল সংখ্যাটা প্রিতম যদি জেনে থাকেন তবে খবরের কাগজে চিঠি লিখে জানিয়ে দিতে পারেন কারণ এতবড় একটা জ্ঞান ব্যক্তিগত ভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা উচিত নয়। তবে হ্যাঁ ব্রহ্মাস্ত্রটি তিনি যেন খুব সাবধানে রাখেন যেটি দিয়ে সবকটি মাথাকে একসঙ্গে 'নক ডাউন' করে দিতে চাইছেন।

হ্যাঁ প্রকাশকদের কথা আমি বলেছি। এই লড়াই-এ প্রকাশকদের আমাদের অনেকদূর সঙ্গে নিতে হবে। তাদের ওপর অভিমান করার কোনো সুযোগ নেই। ছেলেমানুষীরও কোনো জায়গা নেই। তারপর ঠিক ক'মাইল হাঁটার পর কোন নদীর তীরে গিয়ে কারা কাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করবে তা পরে ভাবা যাবে। তার আগে, হে কমরেড আর্থ-সামাজিকতাময়, প্রতিযোগিতাপূর্ণ বুর্জোয়া বিপ্লবের ভূলুণ্ঠিত পতাকাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরুন—কে যেন একজন বলেছিলেন—আপনার নিশ্চয় মনে আছে। ভেবে দেখবেন আমি খব আলাদা কিছু বলিনি। 'লাইব্রেরী পারচেজ' ইত্যাদি কিছুকিছু সরকারী কল্যাণে প্রকাশকরা নানাভাবে টুকটাক চালিয়ে নিচ্ছেন। তাদের বাণিজ্যের একপ্রকার নিরাপত্তা এসেছে। নিরাপত্তা একজন কারবারীকে মানসিকভাবে স্থানু করে দেয়। তাই সাহিত্য প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটি মাত্র পত্রিকার দাদাগিরিকে মেনে নিতে তাদের কোন অসুবিধে হচ্ছেনা। কিন্তু আমাদেরই আঘাত করতে হবে তাদের এই স্থানুতাকে। তাদের চোখে এঁকে দিতে হবে ভয়ংকয় দুঃসাহসী সব স্বপ্ন। একচেটিয়া কারবার বুর্জোয়া বিকাশের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। এবং সেই বিকাশের পতাকাকেই আজ আমাদের ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে হবে। এই দাদাগিরি সহ্য করে তাদের কোনো বাণিজ্যিক লাভ নেই। ঝুঁকি তাদের নিতেই হবে, চ্যালেঞ্জ জানাতে হবে, চারপাঁচটা আঁটপুর লাইব্রেরীর দিকে তাকিয়ে একটা ইণ্ডাস্ট্রি চলতে পারেনা, নতুন 'গ্রাউণ্ড ব্রেক' করতে হবে, এবং হ্যাঁ, আমি এখনও বিশ্বাস করি শুধুমাত্র সাহিত্য ছেপে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নতুন 'গ্রাউণ্ড ব্রেক' করা সম্ভব।

আমার লেখাটি থেকে, ফলে বোঝাই যাচ্ছে, প্রিতম মুখোপাধ্যায় যে বার্তাটি পেতে চেয়েছেন, সেই চাওয়াতেই ভুল ছিল। আরো অনেক উৎসাহীও এই ভুলটিই করেছেন। তাদের জন্যে আমার বার্তা খুব পরিষ্কার—'আজ ভোরে ছিঁড়ে ফেলি সংবাদপত্রের ঘোরছায়া' লেখাটির মধ্যে দিয়ে আমি কোনো সর্বহারা জাগরণের ডাক দিইনি। আমি যা চেয়েছিলাম তা হল বুর্জোয়া প্রতিযোগিতার পরিধি-বিস্তার। না হলে সংবাদপত্রের ছায়াকে ছিঁড়ে ফেলা যাবেনা। আর তা না গেলে প্রিতম মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্নের 'আর্থসামাজিক ধারা' প্রকৃত বিরোধিতার পেছনে ছুরি মারার কাজ করে যাবে, বিরোধিতার সর্বস্বত্ব শুধু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের থেকে যাবে। দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়বেনা।

অজ্ঞাতবাস

এই লেখাটিতে আমি প্রিতম মুখোপাধ্যায়ের বক্তব্যকে আক্রমণ করলাম। কারণ শুধু তাঁর নয়, এই বক্তব্য আরও অনেকের মুখ বা কলম থেকে আক্রমণাকারে আমাদের উদ্দেশে ধাবিত হয়েছে। তাই নিশ্চিত মীমাংসাসূচক প্রতিআক্রমণ আমাদের কর্তব্য ছিলো। ব্যক্তিগত কটূক্তিগুলির জন্যে প্রিতম অবশ্যই বয়স্কোচিত স্থৈর্য প্রদর্শন করবেন কারণ প্রকৃত প্রস্তাবে কটূক্তিগুলির কোনটিই তাঁর উদ্দেশে করা নয়। এগুলি করা হয়েছে একটি ধারণার বিরুদ্ধে, যা প্রিতমের মস্তিষ্ক থেকে যত দ্রুত অপসৃত হয় ততই মঙ্গল।

প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

দেবদাস আচার্য

উৎস-বীজের গান

প্রথম আবর্ত

আমার বাঁ হাতে আছে গোল, ছোটো একটি পৃথিবী,
এর মায়া-রূপে মুগ্ধ, দাঁড়িয়েছি ক্ষণিক প্রহর
অশান্ত যাত্রার পথে, এই সৌরজগতের দেশে।
বহুদূর নক্ষত্রের পথ ধরে এসেছি এখানে,
অনন্ত অনন্ত কাল ভেসে যেতে যেতে থমকে দেখি
উজ্জ্বল মণির দীপ্তি মহাজাগতিক অশ্রুকণা
আমার বাঁ হাতে, ওই অশ্রুকণা বর্ণময়, দ্যুতি
বিচ্ছুরিত হয়, যার আহ্বান শেষ সূর্যটির
আকাশে ধ্বনিত হয়ে শব্দ তোলে, শব্দ স্রোত ধরে
পথ চিনে এসেছি, অমোঘ পরিকল্পিত বিধানে,
বিস্ময় ও সম্মোহন আমাকে জড়ালো ইন্দ্রজালে।

মায়ার অধিক কিছু, প্রেম, যার আবহমণ্ডল
করুণার থেকে বেশি, অন্তর্লোকময় ঐশী বিভা
বহুবর্ণময়, স্নিগ্ধ, স্পন্দন কম্পিত মৃদু আলো
শরীরে জড়ানো, দেখি, সর্বদাই হয় বিচ্ছুরিত
মহামায়া, তেজস্ক্রিয়, আর্দ্র-অনুভূতিময় স্নেহ
আবৃত, নীলাভ দ্যুতি সম্মোহিত করে, ব্রহ্মলোক
স্পর্শ করে ছুটে যায় তার অতিলোহিত কণিকা।

ব্রহ্মার পদ্মনাভি থেকে উৎসারিত ওম্ ধ্বনি
চমৎকার প্রতীকে সে রূপান্তর করে, শব্দ গড়ে,
মহাজাগতিক মৌল ধূলিকণা ভেঙে গড়ে কোষ,
শ্বসন ও উপচিতি তাকে দেয় বহমান প্রাণ,
প্রতিটি কোষের কেন্দ্রে শক্তিঘর সূর্য-আলোকিত
প্রতিটি শক্তির অণু ধরে আছে সংবেদন, স্বর
প্রতিটি অণুর উৎসেচকগুলি সুশৃঙ্খল, জ্যোতি

বিভাসিত করে, এক আশ্চর্য প্রক্রিয়া থেকে প্রাণ
আত্মায় আবিষ্ট হয়, মধ্যবর্তী রূপান্তর-কলা
ছেদচিহ্ন-হীন, যার প্রিয় নাম অধিপ্রাণ, যার
অভীগ আলোকবর্তী বিভা বিশ্বে প্রান্তনক্ষত্রের
অভিকর্ষ স্পর্শ করে, অপার বিস্ময় ঘেরা গ্রহ,
মায়া, অধিপ্রাণ, আত্মা, জ্যোতি-মধ্য-রেখার আবহ
নিজস্ব ফোটন অণু এ বিশ্বে ছড়ায়, প্রসারণ,
জৈব-সংকোচন হেতু আকাঙ্ক্ষার বীজ নিয়ে ছোটে
গ্রহান্তরে, পাঠায় সংকেত মহাপ্রাণের সন্ধানে।

আমি সূক্ষ্ম, অতিজাগতিক
চেতনার ধারা-স্রোত থেকে
ছিটকে আসা পরমাণু এক,
রূপহীন, মায়া-কায়া-হীন
মৌল অণু, পৃথিবীতে এসে
তার রসায়নে মিশে গেছি।
তার নিজ চেতনার স্রোতে
বীজে ও আঙ্গিকে অন্তর্লীন
ষড়ঋতুময় হয়ে আছি।

ক্রমশ নেমেছি এই পৃথিবীর কোষে, অণুকোষে একদিন,
কীটে ও আকরে, জল, স্থল, বন-ভূমিময়, শীৎকারে, শ্মশানে
গুহাচিত্রে সাবলীল, শ্রম-সম্মোহন দৃশ্যে, আদিম-পৌরুষে।
নক্ষত্রের নিচে ছায়াঘন অরণ্যের কোনো কাম-বিমোহিত
হরিণের, ময়ূরের, পিপীলিকাদের প্রজনন প্রক্রিয়ায়,
ঘ্রাণে, গন্ধে, সুবাতাসে, কর্পূরে, বিদ্যুতে, ঝড়ে, পরাগে, পেখমে,
মায়াবী রিপুর টানে জরায়ুর নীল জলে করেছি তর্পণ।
আমার রক্তের বিদ্যা দিগন্ত রেখার বাঁকে বিভূতি ছড়ায়,
স্বপ্ন থেকে জাগরিত, পাখিদের কলতান থেকে জাগরিত
প্রভাতে বালার্ক, কর্ম উদ্দীপন হয়ে আমি ছড়াই সংসারে
আমার এ সম্মোহন, কারখানায়, খামারে, বন্দরে, পোতাশ্রয়ে
সর্বত্রই আলো হয়ে ফুটেছিল একদিন আমার চেতনা।

দেখ, শান্ত হয়ে আসে সমস্ত বিকাল স্তব্ধ অন্ধকার ঘিরে,

দেখ, রাত্রি বিভাসিত হয় মন্দিরের মন্ত্রোচ্চারণে, ঘণ্টায়,
কুয়াশার মৃদু স্তব, জ্যোৎস্না'র শান্ত ঝরে পড়ার ভিতরে
পৃথিবী প্রবেশ করে, প্রতি মুহূর্তের দৃশ্য-বদলের পর
অসংখ্য স্মৃতির কণা ঝরে পড়ে প্রস্ফুটিত রাত্রির গভীরে।
এই সব স্মৃতি-রশ্মি দূরাকাশে ছুটে যায়, মহামানবিক
জৈব-ঘ্রাণ, শ্বাস, স্বেদ লালা ও তরল ক্ষার-ব্রহ্মাণ্ডে ছড়ায়।
পৃথিবীর ঘূর্ণনের বিচ্ছুরিত ছটা পৌরাণিক দেবতারা
আহরণ করে,—এত রূপময় জৈব বিভা দিব্যলোকে নেই।

একটি প্রদীপ শিখা ভেসে যায় ছায়াপথে, নক্ষত্র-লোকের
প্রাণ ছুঁয়ে ভেসে যায়, বহুধা বিভক্ত হয়ে, আপন-আহ্লাদ
ছড়ায় চতুর্দিকে, বিশাল শূন্যোদ্যান, মহাজাগতিক
তারকা খচিত, দিবা-রাত্রি-হীন, বর্ণহীন উত্তাপ-বিহীন
অপার শূন্যের সাম্রাজ্যের ভিতর দিয়ে প্রাণের শিখায়
ভেসে যায়, অন্তহীন, অতিক্রম করে যায় অসংখ্য সূর্যের
আবর্তন পথ, আমি দূর থেকে দেখি সেই শিখার কম্পন
খোঁজে নিরবধিকাল আপনার অনুরূপ একটি পৃথিবী।

পৃথিবীও লোপ পাবে একদিন, কালের আধারে সমাহিত
হবে তার চিন্মোহন নিজস্ব বিক্রিয়া, তবু অন্বেষণরত
পার্থিব সংকেত নিয়ে অনন্ত আকাশে ঐ চিরলোভাতুর
পৃথিবীর কাম-দীপ ভেসে যাবে ব্রহ্মলোকে, একক স্মারক,
জৈব-স্মৃতিময় আলো, অনশ্বর মহাকাশে শান্তগতিময়
পৃথিবীর এ-নিঃশ্বাস।—অনূদিত হবে তার পাঠ কি কখনো ?

ছিলাম আদিতে দূরাগত চেতনার অণু অদৃশ্য আত্মার শক্তি রূপে,
পৃথিবীর অভিকর্ষ টেনেছে আমাকে গর্ভে, জৈব বিকাশের কেন্দ্রমূলে
জীনে ক্রমোজমে কোটি বৎসরের বিবর্তনে গড়েছি নিজস্ব রসায়ন,
স্বর্গ পতনের শোক ভুলেছি সহস্র-ধারা উজ্জীবন অনুপ্রেরণায়।
অসংখ্য চেতনা অণু ব্রহ্মাণ্ডে ছড়ানো আছে, শূন্যের অধারে দিব্যজ্যোতি
থেকে চেতনার রশ্মিকণাগুলি ছুটে যায় অতিব্রহ্মাণ্ডের কোনো দেশে।
কোথাও পৃথিবী নেই, জৈব রসায়ন নেই, শুধু হাহাকার ধ্বনি তুলে
ছুটে যায় নিরবধি, অবিশ্রাম, শূন্যে, কালোতারা গ্রাস করে সব স্মৃতি,
সূর্যের স্ফোটন-বিস্ফোরণে চেতনার শিখা পুড়ে যায়, নক্ষত্রের জিভ
ভয়ঙ্কর শব্দে চেটে খায় মেধা ব্রহ্মাণ্ডের, প্রাণবায়ু, ওংকার ধ্বনি।

মহাকাশে ভাসমান একটি উজ্জ্বল অশ্রু অনন্ত সুদূর থেকে দেখে
বুঝেছি আমারই হৃদ্‌পিণ্ডের কম্পনে তার বুকে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হবে,
যেন সে প্রতীক্ষমাণ, একটি মহার্ঘ অণু জরায়ুতে স্থান দেবে বলে
তপস্যায় ছিল, আমি তার গর্ভে প্রক্ষেপন করেছি আত্মার ইচ্ছা, রস।
সেই সে প্রভাত, স্বর্ণোজ্জ্বল দিন, কামগন্ধা পৃথিবীর স্বপ্নময় দিন,
কুয়াশার ইন্দ্রজালে রামধনু আঁকা হল, হেমন্তের শান্ত তটভূমি
থরো থরো কেঁপে উঠেছিল, সমুদ্রের শিস, দক্ষিণ বাতাস, মেঘমালা
শুভ গান করেছিল, শঙ্খের নিনাদে, উপত্যকায় ঝর্ণার উচ্ছলতা
বন্দনার ঐকতানে নেমে এসেছিল, নক্ষত্রের পুষ্পস্তবকের আলো
ফুটে উঠেছিল মহাকাশ জুড়ে, তারকারা পাঠিয়েছিলেন বর্ণ, জ্যোতি।
সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ধ্যানে রত হয়ে অনুভব করেছিল অতি সংবেদন
অনুভূতি-ঘন এক জীবলোক দূরাকাশে নীলাভ সবুজ, বিভাময়,
জল ও মৃত্তিকাময়, নভোলোকে আচ্ছাদিত, শীত-তাপসহন সক্ষম
বালু কণিকার মতো ভাসমান, সৌরকক্ষে, জীবাত্মায় রূপায়িত হল।
অবিস্মরণীয় ক্ষণ, অনন্য জীবাশগ্রহ, মহাব্রহ্মাণ্ডের প্রজ্ঞা, স্মৃতি,
যা ছিল ভৌত রশ্মিকণা মাত্র, পৃথিবীর রসায়নে হল প্রাণময়।

একটি কণিকা মাত্র, সৌরকক্ষে স্থিত
ছায়াপথে লুক্কায়িত, আহ্নিক গতির
নিয়ন্ত্রণে ঘূর্ণমান, ভৌম-প্রেক্ষাপটে
অস্তিত্ব-বিহীন প্রায়, অতিন্দ্রিয় ধ্যানে
আভাসিত হয় শুধু, ব্রহ্মাণ্ডলোকের
চেতনায়।
তবু তার জন্যে সমারোহে
বহির্বিশ্বের সব নক্ষত্রপুঞ্জের
নিজ নিজ মহাকাশে উড়ল পতাকা,
ওং-ধ্বনি জাগরিত হল নাভি থেকে
ব্রহ্মাণ্ডলোকের।
ছায়া পথ জুড়ে দূরে
মহাজাগতিক বস্তুপুঞ্জের মশাল
মিছিলে মিছিলে বিশ্ব হল আলোকিত।
সহস্র বৎসর ধরে দীপ্যমান শিখা
ছড়াল সংকেত দূর বিশ্বের আকাশে :
পৃথিবী নামক এক অলৌকিক গ্রহে

জৈব-রসায়নে ক্রমোজম কোষ-কলা
নির্মিত হয়েছে, যার প্রতিক্রিয়া হেতু
বস্তু প্রাণে রূপায়িত হয়, রূপায়িত
হয় প্রাণ চেতনায়, চেতনা বিন্দুটি
ধ্যানে রূপায়িত হতে পারে, ধ্যান-লোক
ভেদ করে সূক্ষ্ম বোধ-লোক গড়ে ওঠে।
সেই বোধ-বিন্দু মেধা রশ্মি কণা ছুঁড়ে
জীবনের কলতান উপহার দেয়
জগতে জগতে।
ছিল এ জগৎ শুধু
বস্তুভারে ক্লান্তিকর, নিরেট, নিষ্প্রাণ,
অন্ধকারে অগ্নিরাশি মহাতারকারা
ছড়ায় লোলুপ ফণা, অদৃশ্য-গহ্বর
গ্রাস করে ভ্রাম্যমান বস্তু-পিণ্ড, শিলা
আগুন ও ভস্মরাশি মৃত নক্ষত্রের।
প্রাণের নিনাদ-হীন জড় ছায়াপথ
নিরন্তর প্রসারিত হয়, অবিশ্রাম
ছোটে নিজ গ্যালাক্সিতে, বস্তুর পাহাড়
সংখ্যাহীন, পরিমাপহীন, কোনো গতি
অন্তহীন ঘাতে করে নিয়ন্ত্রণ ওই
অগ্নিময় নিষ্প্রাণ বস্তুর জঙ্গল।
তারই মধ্যে কোনো এক সৌর পরিবারে
জন্ম এই প্রাণময় স্নেহার্দ্র সজল
একটি জীবন্ত গ্রহ, শিশিরের কণা,
অসীম অনন্তে ভাসে, প্রাণের মূর্ছনা
তড়িৎ-তরঙ্গরেখা হয়ে স্পর্শ করে
জগতের উৎস-কেন্দ্র, চেতনার ঘাতে
ভাঙায় অনন্ত নিদ্রা ব্রহ্মাণ্ড লোকের।
সে প্রাণ সে চেতনার স্নেহ-রশ্মি কণা
বিশ্বের প্রথম বীজ, শান্তি, ছায়া।

বপন করেছি প্রাণ, অসীম অনন্ত প্রাণ-বস্তু থেকে উৎসারিত চেতনার কণা,
পাথ রর মধ্যে আছি স্থিত হয়ে, নদীতে রয়েছি বহমান, বীজে প্রকাশ উন্মুখ,
সঙ্গীতে মূর্ছনা হয়ে হৃদয়ের গ্রন্থি খুলে রয়েছি সতত যুক্ত বোধে, চেতনায়,

আমার স্নায়ুর টানে মধ্যরাত্রে খুলে যায় নিরন্তর প্রস্রবণ মায়া প্রজন্মের,
আমার নাভির দ্যুতি অন্তরীক্ষে আলো হয়ে ছড়ায় স্বপ্নের পোকা তনুতে, কেশরে,
যজ্ঞে আছি, শস্যে আছি, রয়েছি কুম্ভকে, কীটে, গর্ভিনীর ভ্রূণ-ফুলে ত্রিগুণ আত্মিকা,
মননে চিন্তনে মায়াজাল ছিন্ন করে সূক্ষ্ম বুদ্ধিকণা হয়ে প্রাণধারায় মিশেছি।
হিরণ্য-গর্ভের নাদ আমি, কোটি চরাচরে অখণ্ড কম্পন স্রোতে ছড়িয়েছি স্বর,
বিদ্যুৎ তরঙ্গ-স্রোতে ভাসিয়েছি গর্ভরেণু, কাম-কীট, জৈব-শক্তি কোটি প্রজাতির।
গুল্মে আছি, গানে আছি, গহন বিজ্ঞানে আছি, রাগ ও পরাগে আছি চিরন্তন স্মৃতি,
আত্মা ও বুদ্ধিতে আছি, অস্মিতা ও অবিদ্যায়, আছি সর্বজীবের চক্ষুতে সূর্য হয়ে।
ঘ্রাণে ও রন্ধনে আছি, হৃদয়ের তন্তুতে, দেবালয়ে মৃদুস্বর প্রার্থনা সঙ্গীতে,
দৃশ্যে আছি মনোহর, অদৃশ্যে অরূপ ধ্যান-স্রোত হয়ে চিরন্তন কল্পলোকময়,
প্রতি সৃজনের অনুপ্রেরণায় বারবার করেছি নিজেকে ব্যাপ্ত প্রাণ-শক্তি রূপে
সহস্র পদ্মের দিঘি কাঁপে ভ্রমরের গানে আমার স্নায়ুতে হাওয়া যখনই লেগেছে।
স্বপ্নে আছি, বাস্তবেও, চেতনা সংঘাতে ঊর্ধ্বে তুলেছি পার্থিব ধাতু নির্মিত নিশান,
অসীম বৈভবে আছি, সন্ন্যাসীর স্তবে আছি, রয়েছি সমুদ্র-স্রোতে, ভূগর্ভে প্লাজমায়।

এত প্রাণ, এত উন্মাদনাময় সৌরগ্রহ, মহাবিশ্বে মরুদ্যান, আমি
ক্ষণিক বিশ্রাম পেয়ে তার ছায়া সুশীতল বাতাসে আজানধ্বনি তুলি,
সীমা ও মাত্রায় বাঁধা, জীবনের পুনরাবির্ভাবে বিবর্তিত, ছেদহীন,
মিশে গেছি করোটিতে, প্লীহা ও যকৃতে, প্রজননে যৌনদেহে রূপময়।
সৃষ্টি অন্তহীন, প্রতি মুহূর্তের ঘাত আদি-উৎসের সংকেত ধ্বনি তুলে
রূপান্তরে বিকশিত হতে থাকে, আমি তার প্রতিটি গ্রন্থনা কেন্দ্রে দেখি
ব্রহ্মাণ্ডের আদিরূপ, বিশ্বের বীজাগার, অনন্তের গবেষণা গৃহ
ধাতু ও ফসিল, তেল, লাভা, মধু, ক্ষার, নুন, হিমবাহ, ফসফরাস, শিলা,
প্রতিটি একক মৌল রসায়নে বিভাজিত, অসীম শক্তিতে ধাবমান
সর্বদাই হয়ে ওঠে চিরস্মরণীয় রূপে আপন সত্তায় প্রকাশিত।

থেমেছি এখানে আমি বিশ্রামের লোভে এক চির ভ্রাম্যমান ধূলিকণা,
ছিল না সংবেদ, বোধ, করোটির বিভূতি বা রসনা, ইন্দ্রিয়, অহংকার,
মহাজাগতিক ভস্ম থেকে চ্যুত, ছিটকে আসা অণুবীক্ষণিক রেণু আমি,
কেবল দেখেছি কোটি সূর্যের আকাশে কোনো স্থান নেই, আশ্রয় নেই,
প্রাণ নেই, মায়া নেই, শূন্য গ্রাস করে শূন্য, তারকা ভক্ষণ করে তারা,
কোথাও নেবুলা জায়মান কোনো মৃয়মান লাল নক্ষত্রের মেদ খায়,
বায়ু নেই জল নেই, ক্ষিতি নেই, পল-অনুপল নেই, দিবারাত্রি নেই,
বর্ণ নেই, শব্দ নেই, গান-তান-স্বর নেই, নেই নেই শুধু নেই নেই,

নিঃসীম শূন্যের গহ্বরে কালো, ধূ-ধূ কালো, আকস্মিক পদস্খলনের
পর ছুটে যায় সেই শূন্যের ভিতরে অণু-পরমাণুময় ধূলো ঝড়,
সেই ঝড় থেকে মুক্ত অণু এক ভাসমান মহাশূন্য অতিক্রম করে
এসেছি এ পৃথিবীতে, জল দাও, আলো দাও, স্থিতি দাও, প্রাণবায়ু দাও,
জিহ্বা দাও, মৃতি দাও, শূন্যতা হরণ করে আত্মা দাও, কামবীজ দাও,
ব্রহ্মময় নিরাকার থেকে ভ্রষ্ট করে মুক্ত করো, দাও আকাঙ্ক্ষার মধু,
আমার চোখের মায়া নিয়ে তুমি খেলা করো, হে পৃথিবী, আরো কিছু কাল।

শুভেচ্ছা সহ—

বলরামপুর নিয়ন্ত্রিত বাজার সমিতি

বলরামপুর

পুরুলিয়া

অষ্টক

সুকুমার ঘোষ

প্রথম মুদ্রণ
১৯৬১

রচনাকাল
১৯৫৩—৬১

পুনর্মুদ্রণ
পরিমার্জিত ১৯৮৯

সূচি

প্রস্তাবনা
নেপথ্যসাগর
পরস্পর
দৃষ্টান্ত
মুক্ত জলের স্মৃতি
প্রব্রজ্যা
শোককুণ্ণ
শেষ রজনী

দীর্ঘ পঁচিশ বছরেরও আগে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। এর কিছুদিনের মধ্যেই বইটি নানা কারণে দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে পড়ে। তাই অনুজপ্রতিম অরুণ যখন এটি তার পত্রিকায় পুনঃপ্রকাশের প্রস্তাব দ্যায়, আমি উল্লসিত হ'য়ে সায় দিয়েছি দুটি কারণে। প্রথমত, নিজে থেকে এটি পুনঃপ্রকাশের উদ্যম আমার হতো না, আর দ্বিতীয়ত, এই উপলক্ষে কিছু সংযোজন বর্জন করে বইটির একটি স্থির রূপ দেবার সুযোগ মিলল। এই হিসেবে বইটি পুনর্মুদ্রণ নয়, নতুন সংস্করণ।

প্রসঙ্গত, 'প্রকীর্ণক কথা'র বদলে 'শোককুৎস' নামে যে কবিতাগুচ্ছ যোগ করেছি সেটির রচনাও মূল গ্রন্থের সমকালীন।

মে, ১৯৮৮ সুকুমার ঘোষ

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ :

জলে স্থলে অন্তরীক্ষে
না সুখ না দুঃখ তবু

প্রস্তাবনা

১

আমি এই শতায়ু বর্ষায় এক পূর্ণতর নদী
মাছের ভরাট চোখে যাত্রার বিবেক হয়ে বহুকাল
আয়ো বহুকাল জেগে ভুলবো না ঘাসের স্পন্দে
মনুপাঞ্জিকার রাত্রি নক্ষত্র ও তুহিন বিশ্রাম
বালু এসে থরে থরে ভরিয়েছে উটের পায়ের দাগ
এবং বর্ণিত দৃশ্যে পুরাতন সমুদ্রের গান
কই সে নীরব সূর্য এবং বাচাল রশ্মিধারা
ধৌত করতলে কই পাতার পিঠের মতো ছত্রাশির ছায়া
রোদ ছায়া ছায়া রোদে আমি এক পামর যুবক
স্খলিত নারীর স্তনে ঝরিয়েছি শাশ্বত শৈশব
জাগানো পাখির ডাকে রাতে যে টুসটুসে ফল
নক্ষত্র ও শিশেরের গায়ে আনন্দে জড়িয়ে থাকে
কাজের বাড়ির মতো অন্য সব ভুলে—আমি তাকে
একবার দুবার নয় বহুবারই
নিংড়োতে চেয়েছি
হৃদয়ের খোঁনা শস্য কোনদিনই সুরেলা বাজে না
পরন্তু মুহূর্ত-গ্রন্থি এতো ছলা জানে
যে কেউ মোচনে যাবে অসাবধানে ছিঁড়ে ফেলবে
সম্ভাবনা কাঁটালের মুচি
সংক্ষেপে, নীরব হওয়া
বহুগুণ সান্ত্বনার কথা, কথা হচ্ছে
সান্ত্বনা কজন চায় আর কজনই বা
নিয়ন্ত্রিত ছন্দে গুনবে একটি করে নিরুত্তাপ তুড়ি

২

উপমা প্রেক্ষা, উপেক্ষা করো কাকে
দ্যোতনার চেয়ে বিশাল অদ্যতনী

অজ্ঞাতবাস

ভালোবাসবার গ্রন্থি যে সাতপাকে
উল্টো ঘোরালো সে শুধু পরশমণি

খ্যাপার মতোই খুঁজছে, আমরা কই
ধৈর্য মানছি ফাৎনার মুখ চেয়ে
শোলাটা ডুবলো আমাদের পই পই
মানা সত্ত্বেও, ছবিতে মূর্ত কে এ

ধরা দিচ্ছেনা ধার দিয়ে তবু হাঁটে
শয্যায় হাসে সাহসী বিষ্ণবতী
নেপথ্য তার মৃত সৈনিক পাঠে
কমায় বাড়ায় পাদপ্রদীপের জ্যোতি

৩

কে তুমি পিছনে আছো ছায়া দেখছো দেখছো না আমাকে
যাকে তুমি প্রাণ দিয়ে চাও তাকে ভাসাও নদীতে
এ সেই পাষাণ নদী এর মুখে জড়ুলের সুস্পষ্ট নিশান
আমাকে আঘাত দিয়ে ডেকেছিলো এবং সাহস দিয়ে
এবং সহসা দিয়ে ডেকেছিলো কিন্তু জানি ও সবই ছলনা
কে তুমি পিছনে নেই ছায়া দিয়ে ঢাকছো না আমাকে
এখন সমস্ত আলো ধরিত্রীর কোলে এবং সময় যেটা
ঢালু পথে গড়িয়ে গিয়েছে তার ধ্বস্ত অভায় ঘনাচ্ছে
শেষ নতিস্বীকারের দিন,
সারারাত হাওয়া বইছে উত্তুরে কপাল ছুঁয়ে দক্ষিণের
ক্ষীণ সরোবরে এবং কনুইয়ে:ঠেলছে মীন অন্ধকার
ভরসা দরদী কাব্য আর সব রচনা অসার
কেবল সারের মধ্যে দিন রাত্রি এই জেলে দুটি
ক্ষেপজালে প্রতিক্ষেপে তোলে ট্যাংরা পুঁটি
খলসে চাঁদা ফ্যাঁসা চিংড়ি গুগলি ও শামুক
ওদের নিজস্ব ধারা বেধে আসে ওদের পিছনে
আমরা তাতে স্বাদ পাই এবং কামুক পরিণতি
সুন্দরী দেবীরা আর মহাপ্রাণ শব্দাবলী নিরাগ্নি অঙ্গার
ওই সব শব্দে আর ফোটেনা অধরও
তবু পূর্বী সাধকেরা বলেছেন এখনো বলছেন ধৈর্য ধরো

নেপথ্য সাগর

১

প্রারম্ভে শৈশব ছিলো, শৈশবেরও আগে ছিলো নাম
প্রথম ফসল ছিলো বীজখণ্ডে, খণ্ড খণ্ড বীজে পরিণাম
অমর মৃত্যুর, অরা ইব আলো অন্ধকার
দীপের নশ্বর রক্তে সময়ের বিচলিত ভার
স্খলিত ফুলের বর্ণে অবসন্ন বিকেল হারায়
এবং দিনান্ত হয় দিনেরই তারায়
এ সময়ে বাতাসের ঢোলা জামা গায়ে
পার্কের নীরক্ত মমি চলে গেলো কোনো দূর গাঁয়ে

মল্লিকার সাদা হাতে এই দিন এই রাত্রি
স্মৃতির বিষণ্ণ মঞ্চে বিস্মৃতির পাত্রপাত্রী
ঝিনুকের সংগোপনে লুকিয়েছে সত্তার প্রণয়ী
যদিও আসন্ন মুখ তন্ন তন্ন তবু কই
অন্তরে ডোবায় হাত মুহূর্তের পরিত্যক্ত খোলস, সন্ত্রাস
হোক না কঠিন মাটি ডাঙাতেই নিমজ্জন নেই
খেয়ার ওপার নেই কিম্বা দীর্ঘশ্বাস

গাঁয়ের মানুষ আমরা আনকোরা সড়কে হেঁটে
চেটে যাবো দৃশ্য ও দোকান, নারী ও নরক, সুরা ও সুরুচি
বুটের শিথিল শব্দে জেগে উঠবে গুটিকয়
লক্ষ্যভ্রষ্ট পাথরের কুচি,
এই সব অদ্যরজনীর অভিনয়

যারা হাসে নিহিত ছায়ায়, গোড়ার নিহত রোদে কাল
এই নদীয়ায় তাড়িয়েছে বুনো শুয়োরের পাল
শুয়োরেরা দৌড়িয়েছে পশ্চিম প্রান্তরে
সেখানে প্রত্যেক ছায়া গাছ সাক্ষী করে
কাটাচ্ছিলো অলস সময়, অবশেষে

অজ্ঞাতবাস

দেয়ালের ছায়া বেয়ে রাত্রি নামলো দিনের দাওয়ায়
শোকে শিকারে ও নেভানো মশালে
নভোমূলে একটি তারা চাটছিলো নগণ্য চোখে সারা দেশ
বাঘহীন সেই দেশে ফেউ ডাকে নিজের খেয়ালে

শিকারীরা ভালো করে পরস্পর তাকালো না
বিনিদ্র ছায়ায় শূন্যে দাহ করলো একে অপরের ছদ্মবেশ
এবং স্বপ্নের ভাষ্য শিকারের জটিল ক্ষমায়
দিন যায় সারথীর বেশে
রাত্রি থামে রথের চাকায়

২
ভাঙার শুরুর আগে জল ছেড়ে জেগে উঠলো মাটি আর ধান
শিষে শিষে নাড়া খেলো প্রতিধ্বনি বায়ু
সাত রাত সাত দিন সাঁতরে এসে যখন জলের পায়ে
হুমড়ি খেলো পুরোনো শামুক—যেখানে রাত্রির আয়ু
কপট শঙ্খের খোলে রুদ্ধ ছায়া অঙ্গুলিপ্রমাণ
এবং মাটির বেড়ি
খসে যায় পদতলে ঠিক যেন একটি তরল সাপ
নতুন প্রলয় থেকে ভেসে ওঠে লক্ষ্মীর হাতের মাপ
স্রোতের সান্নিধ্য পায় শ্যাওলা পলি ভেড়ি
ক্রমে জাগে উষার স্মারক হাতে
স্বামীহন্তারক লাল, বেগুনির সতিন লাল—

যে যার পুঁটুলি বেঁধে সঙ্গে নিলো
দীর্ঘ যাত্রা, এদিকে আলোর দেখা নেই।
জলও প্রায় ফুরিয়ে এসেছে, আছে যদিও বা
সরু সলতে নদী কিন্তু তাতে আগুনের গতি
মোটে না থাকায় দেখো মেটে না পিপাসা
আমাদের এই যাত্রা দৃঢ়তম ইন্টর‍্যাশনালে
রজনীগন্ধার মুখে প্রজাপতি কাঁপে স্মৃতি হয়ে
সংগ্রাম কি হিংস্রতায় কিম্বা সেই পূর্বপরিচিত
বিশ্বাসহানিতে এবং সম্মুখে দেখছি
উদ্যত বজ্রের নিচে কী বিশাল অপেয় সাগর

৩
আমাদের এই খেয়া মাঝিহীন মাঝদরিয়ায়
ঢেউয়ের মাতাল নাচে অপ্সরীর বেতাল নূপুরে
প্রভাতের অনুভব হাত রাখে পাশের শিশিরে
অথচ সৃষ্টির বিনিময় অন্য এক শোভার পৈঠায়
বৈঠায় যেমন এসে কল্লোলেরা ঢেউয়ে ফিরে যায়

সৌন্দর্য কেবল একটা থিয়োরি বা তত্ত্ব নয়
প্র্যাক্‌টিস যেটার ঠিক, সাদাবাংলা কাজ, বলবো, তাও

এই বিংশশতাব্দীর জনপদে
এতো সব নতুন নতুন কল কারখানা স্পুর্ণনিক লুনিক
ক্রমবর্ধমান মজুর, তাদের বস্তি,
অথচ রাজার জন্যে সিংহাসন নেই,
গণতন্ত্রে তন্ত্র মানে মিনিস্টার গণ মানে আদম সুমারি

শাসনের ছিনিমিনি শুকিয়েছে যোগেশের সাজানো বাগান
যদিও সেচের খাদ একেবারে ধুলোয় মজেনি,
সরকারি প্রকল্পগুণে বাঁধে আর ফাঁদে সেই সঙ্গে
দরকারি প্রমাদে জল আর পরেশের জমিতে আসে না
ভাসে না তালের ডিঙি এমন কি শ্রাবণ মাসে না
ক্বচিৎ যদিবা আসে ভাসায় দুকূল

সমূহে বিনাশ ভেবে কালান্তক ব্যূহের সম্মুখে
বিচ্ছিন্ন প্রত্যেক মুখ শব্দহীন দগ্ধো পৃথক পৃথক
নদীতে একমাত্র খেয়া শিউলির অশ্রুর পুরোভাগে
দিন-যামিনীর সন্ধি সিক্ত করে ডোবে আর জাগে
মুক্তোর অতলে ডোবে, ওঠে ধুলোর শিখায়
যতো না বিষাদ মায়া এড়াতে গিয়েই

এইসব বাড়িঘর আত্মীয়স্বজন কিম্বা মুদি গয়লা ধোবি
এই একটিবারে হয়তো ফোটে কোনো গোপন মাধবী

নির্বিকার কড়ির জাঙালে, চুপিসাড়ে যে সুরভি আছে
বাতাস বিবেকে সেটা ছাড়ে কিম্বা বাছে
বা নির্দিষ্ট ইশারায় একটি মন অন্য মনে খোলে
আমাদের স্মৃতি ভোলে
বাথার কুলিশ অবয়ব, তার আগে সোজাসুজি
একটি বার ফিরে চাওয়া
তবু যে দিকেই চাই দেখি পঙ্গু পাতার ঠিকুজি
ঋতুর সংকীর্ণ মঞ্চে মেলে আছে ছত্রভঙ্গ হাওয়া

৪

শুধু শিল্পে নিরন্তর প্রয়োগে অক্ষয়
মূল ধাতু নির্মূল প্রত্যয়
প্রতিদ্বন্দ্বী দুই শিল্পী দাতা ও গ্রহীতা
ধাতু শুধু স্বর্ণাভায় হাসে
আগুনের অন্তর্দাহে যদিও সমান আলো ভাসে
তবু পাত্রভেদে কোথাও প্রদীপ কোথাও বা চিতা

ফুলের প্রসঙ্গ ভুলি জ্বালানি কাঠের প্রয়োজনে
একটি যে প্রদীপ ছিলো দীপাধারে
বাতাস মিলিয়ে গেলো তার অন্ধকারে
ফুলের প্রসঙ্গ ভুলি এইভাবে দেহে আর মনে

কিন্তু আত্মা ? সেটা শুভ্র, কেবল কবির সঙ্গে তুলনীয়
অথচ কবিত্বে বারে বারে লুপ্ত হন কবি নিজে
অবশেষে জ্বালানির সমস্যাটা চোকে
তখন আবার বারান্দায় রেলিঙের ধারে নার্শারিতে
কোনো কোনো কম্পমান হাতে বা হৃদয়ে
ফুলের প্রসঙ্গ আসে, দিন ভাসে রাত্রির ভেলায়

ক্রমশ প্লাবন সরে নিজের গোপনে
চিহ্ন সরে বুক থেকে মনে
ভিটেকুমারীর গর্ভে নিবেদিত মাদারের ফুল
পৌষের সীমানা ধরে টানে
গেরস্থালি সন্ধে আসে শঙ্খ আর ঘাটের কলসিতে

আমি সেই সুরভি যেটাকে
খুঁজেছি বিতানে বহুবার
নাকের ডগায় যেন তাকে
পেয়ে গিয়ে হারাই আবার
তখন সে নক্ষত্রের আলো
আড়চোখে ঈষৎ তাকালো

কিন্তু এই পৃথিবী কেবলি
হারায় নতুনতর ঘাটে
পুরোনো মাঠের চেনা পালি
ডিঙিটাকে ফের নবপাটে
সাজিয়েছে অথচ জানি না
এই ডিঙি সেই ডিঙি কি না

তাই বলি সার্থক এখানে
ভেঙে ভেঙে শুধু সৃষ্টি করা
জীবনের রহস্যের মানে
পরিপূর্ণ কলসিকে ভরা
শুধু তার শেষ কলম্বর
নিয়ে যায় নেপথ্য সাগর

পরস্পর

১
যা কিছু জীবন্ত তাই ক্রমাগত ঘটে
আজ এই কঠিন সংকটে
দেখে নিয়ো ভুল তৃষ্ণা অথবা কৈশোর, কৈশোরের প্রাণ
কখনো আবদ্ধ নয় শিকলে বা উদয়াস্তে
অশ্রুর সাম্রাজ্য নেই, হাতে হাতে দেনাপাওনা সব
চোখের আড়ালে গেলে যৌবনের শান্তিপর্ব
বড়োদের ঢিলে চামড়া, ইসি ওয়াস্তে
নগরে গোধূলি নামে, অন্ধকার আলোকসম্ভব
এবং আঁধার বুঝি আলোকের গান

আহত স্বপ্নের রশ্মি দুহাতে কুড়িয়ে ছায়ার প্রান্তরে ডাকাডাকি
একি খেলা, ছেড়ে দাও পোষা পাখি
হিংস বাঘ কোলে নিয়ে জড়াও আদরে
মেঘ কি দেবেনা চোখে দুই ফোঁটা জল
সমুদ্র সাজবে না তার স্তন্যদাতা মা
রোদ্দুরও কি ঘুমোবে এখনি
বসবে না ছায়ার রাজ্যে পুতুলের প্রজাপতি হয়ে
ডাক দাও তোমার বকুলকে আজ নাম ধরে
ঘরের পিছনে পথ শ্মশানের পথ
সামনে দিয়ে কড়া নাড়ে দরজায় পিয়ন, দিদি লিখছে
একে ওকে এবং তাকেও
ভরসা কেবল আছে দক্ষিণের মাঠে
(হরিয়াল দূরত্ব বাড়ায়, বুনো ফুল চেয়ে থাকে
কাছে) ধুলোরা অস্থির হয়ে
হাঁটু অব্দি ওঠে, অতঃপর গোধূলি গড়ায়
সম্ভাব্য চাঁকতে চিনে মূর্তি নবুপায়

পৃথিবীর দিকে দিকে এতো দৃশ্য এতো গন্ধ এতো নীরবতা

তখন বিজন ঘরে সব কাজ খেলা
সায়াহ্নে ফুরোয় সারা বেলা
হে পৃথিবী, হে আদি মোহিনী ছায়া
তোমার অক্ষত হাতে এই হাত দুরাশার সোঁতা
সেই অগ্নি ভালোবেসে দাহ—তার জায়া—
তোমার যন্ত্রণা থেকে ফুটিয়েছে শিশুর স্বদেশ
ডোমার হৃদয় তুমি বলেছিলে দেবে
হাত দেবে আহত হৃদরে আমাদের,
সোনার মুকুটে ছোঁবে আমাদের কপালের রোদ
শিল্পত্বে ঘুচিয়ে দেবে বর্ণ আর বর্ণনায় ভেদ
দিনে আর রাতে, বলবে, জেদ নেই
ভাঙা প্রাসাদের কক্ষে অথবা কক্ষান্তে
বিলুপ্ত বিভঙ্গ কটি লজ্জা দৃষ্টি ভ্রষ্ট সজ্জা
যেন পরিহাস, মুকুরে অর্ধেক কান্না বাকি অংশে
কাল তথাগত, এসময়ে নিষেধের অলঙ্ঘ্য পাহাড়
পঙ্গু কি পেরোয়

শুধু শান্তি বুনোফুলে একটি অশ্রুপাত
কাঁটায় রক্তের ফোঁটা ফোটায় প্রভাত
কি বিচিত্র এই দেশ আনন্দ প্রভৃতি···
পাদদেশে আর্দ্র নদী সন্ধ্যার নির্মোক—
তার মূল উন্মোচনে গাছেরা আলোকস্পর্শী
নদীর সন্তান ঢেউয়ে জলাঙ্গী মাতার প্রীতি
পাশ ফিরে ফিরিয়েছে শোক
তবু দেখো হাসির নিখিল পড়শি
কান্নায় লুটোয়
প্রচ্ছন্ন পদ্মের দীপে কলঙ্কী চাঁদের মৃত হাসি

২
পামের অনেক নিচে ঘাসের তৃতীয় শ্রেণী
সেখানে দাঁড়াও স্থির হয়ে

বৃথাই মাতাল বলে, আমি অভাজন।
একথা নিবিষ্ট চিত্তে শোনে সভাজন॥

অজ্ঞাতবাস

খোপে খোপে পুষিনিকো শ্বেত কবুতর।
এবং চাপান শুনে গাইনি উতর ॥
ধোঁয়ার শিথিল মূর্তি নগরের বুকে থই থই।
মদের মাতাল আমি নই ॥

শেষ আলো ঠুকরে নিয়ে অন্ধকার বাঁকে
উত্তীর্ণ তপস্যা যায় অন্ধকার পঙ্কজের পাঁকে
পার্কের পুকুর যেন গিলে করা থান
লক্ষ্যকাণ্ড হৃদয়ের নিরুপসংহারে
বাতাস লাফায় যেন পুত্র হনুমান
কুকুরের সামনে আমি রেখে যাচ্ছি ভুক্তশেষ হাড়ের পাহারা

আমি আর এই শূন্য, জ্যোৎস্নার ফারাকে,
মূর্তিমান দুজনেই সামনের কিছুটা আলো খাবলে নিই
প্রকৃতিস্থ অবয়বে, স্বচ্ছ আর অর্ধস্বচ্ছ এই দুই ছায়ার আয়নায়
ভুতুড়ে আলাপ শুনি কোন অসুস্থ ঘরের বারান্দায়
মহানগরীর হৃৎপিণ্ডে এমনও অসুস্থ ঘর আছে
ছেলে তাঁর ভীষণ কায়েলি, মা আছেন অর্ধস্ফুট
প্রবীন কলির মতো মগ্ন চোখ (আমরাও মগ্নচোখ)
এ নৈশ স্বভাবে এসে সুস্থ হতে পারিনে কখনো
স্বপ্নঘন রাত মনে পড়ে
অথচ যাত্রার আগে অপরের আলোও হয়েছি
কিন্তু কতিপয় মানুষের বাসস্থানে
যদিও বিশুদ্ধ জল মোটেই মেলে না, আবর্জনা
যারা ফেলে তারাই কুড়োয়, তারাও গিয়েছে নাকি
সাবালক রোদের উত্তাপে নেয়ে খেয়ে পাড়ায় বেড়াতে
এর বেশি আমাদের চাইবার কি আছে
'এ কিরে মায়ার খেলা, মুক্তি নাই, বসিয়াছি দাঁড়ে
মদের আমোদ সব লুপ্ত গেঁয়ো ভাঁড়ে'—
বৃথাই দুচোখ চাপি ভয়ের রুমাল
অশ্রুতে ভিজিয়ে তুলি কষ্টকল্পনার অন্ধকার, ভাবি
ওখানে বিশাল নদী, পাশে নদীতম অন্ধকার জমে আছে
আমাদের চন্দ্রাহত ঠোঁটে অথচ এখানে
গেঁয়ো পেয়াদার মতো নিঃশব্দের হাঁকের আড়ালে

চোরের এগোনো পায়ে ধাক্কা দেয় প্রতিগতি
কিন্তু আজ, আজ আমরা চেখেছি নরম জল
অন্তত হাতে না হোক হাতের বাঁধিত কুয়াশায়

ধীরে ধীরে রাত্রির গোলাপ বুঁজে আসে
রাত্রির কনিষ্ঠ বোন ঊষা তার বুকের কুঁড়িটা
ফোটাবে নতুন করে অরুণের পায়ে
আমাদের এইসব না চাওয়া না পাওয়া

৩

দেখো কী সুন্দর নাচে তিড়িং তিড়িং
সবুজ ঘাসের ডগে অবুঝ ফড়িং
কুয়োয় মেয়েরা যাবে কোমরে পৌঁচিয়ে
চওড়া পাড় শাড়ি, মধ্যে একটি মুগ্ধ ফুল
সময়ের ক্লান্ত পিঠ বিকেলে ঠেসিয়ে
অলক্ষ্যে বসাবে লগ্ন সন্ধের পৈঠায়

প্রেতের হাসির নিচে আজ কার বাসনা আকুল
আইবুড়ো মেয়ের কাঁধে আঁচলে ফাঁপায়
দেহাতি চাবির গল্প, সিন্ধুকের চাবি
খুলে দেয় বিশ্বনিন্দুকের বাসা, ভুল করে ভাবি
অনেক কিশোর কথা সংকেতের প্রৌঢ় ঘর খোলে
বিশ্বের রহস্যে যেন স্বাদু এই গোধূলি-সম্পাত
শ্রুতকীর্তি শ্রুতমন্য এ সব কাকের নাম তাও লোকে ভোলে
কোকিলেরা গানে খোলে বসন্তের ঝুঁটি
ঘুঘুরা রটায় ছুটি জুটি বেঁধে, রোদ্দুরের গুটি
ভেঙে দিয়ে রেশমি ছায়া প্রসন্নতা আঁকে
দিনের কঠিন মুখে বিকেলের তিলে
ঘরের বউয়েরা সব দেওরের পড়ার টেবিলে
বাতি জ্বালে
কুয়োর দড়িতে রাখে ক্ষমাসিক্ত হাত

সৌন্দর্যের অন্তরাত্মা বাইরে মেলবে বিস্ময়ের পাখা ?
অন্তরের দুরুদুরু সুরভিও তুলে ধরবে ঢাকা ?
তমমুখ কাছে টানবে ? বহিরঙ্গ

দীপ তার অন্তরঙ্গ
উদ্দীপনা হবে ?
নদীর কোমরে কবে পুরুষ নারীর প্রতি হবে অভিমানী ?
তবু দিন এবং দুরাশা, রাত্রি আর জাতিস্মর গ্লানি।

৪

সান্ত্বনা যারাই দিক, সান্ত্বনা তো
তাদেরই সৌজন্যে, এ কোন সান্ত্বনা বলো
হাতে হাত হৃদয়ে ভাঙেনা দীর্ঘ
নীরবতা, গড়েনা সোপান
ভাঙে না, গড়ে না
যন্ত্রণা যারাই নিক, যন্ত্রণাও
তাদেরই সৌজন্যে, এ কোন যন্ত্রণা বলো
রেখায় থামেনা কোনো অনুতপ্ত
রেখা, চলে না ধারায়
থামে না, চলে না
হাওয়া চলে নেচে নেচে গুহায় আলোকে
সন্ধ্যার প্রকোষ্ঠ থেকে প্রভাতের বিম্ব ওঠে, টানে
যৌবনের অভিভূত হাত অথচ নেপথ্য ঘূর্ণি
খুব কাছে আনে না কিছুই

দৃষ্টান্ত

১

গোটে যে কথা বলেছিলেন আর আমি
যে কথা বলি নি—সেই কথার অক্ষরে
আরেকটি অক্ষর, অক্ষরের অন্তর্যামী
অন্য অর্থ, তার পাশে ঘাসের অন্তরে
অন্য কোনো ঘাস—সবই কিন্তু বিচলিত
করেছিলো আমাদের এবং তাদেরও
নিয়তই সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে ফেরো
কে গো তুমি সোনার প্রতিমা, অন্তরঙ্গ
পাখির ফুসফুসে নাচে দীর্ঘ চৌপদীতে
কোনো রূপসী নটিনী, তার নামে রঙ্গ
জানি অথচ বলবো না, সেই লীলাবতী
শিউলি গাছে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে, জানি
কোনো টাটা কৃষ্ণমাচারির কিছু তাতে
এসে যায় না, আমারও না, শিউলিটা নিশ্চয়
তার কথা ভাবছে না কি, মানুষের মধ্যে
সে মানুষ, হৃদয়ের মধ্যে সে হৃদয়
ঘাসের অন্তরে সেই ঘাস ভাবছে না কি
এ সমস্ত জঞ্জালের কথা—এ জঞ্জাল
জ্ঞানের গোড়ায় এসে পোকার আবাস
হয়ে বাড়িয়েছে জ্ঞানপাপীদের সংখ্যা
আমরা শুধু তার তলে চাপা পড়ছি যথা
মিলের দুর্বোধ্য শব্দে চাপা পড়ে কথা
কিন্তু যেটা সহজাত সেটা মেলে ধরা
বিগতকে মেলে ধরা বর্তমানে, আর
বর্তমান অদূর ভাবীতে, কিন্তু সেই
বহুদূর—সেখানে কল্পনা যায় বটে
অথচ কিছুই ফিরে রটাতে পারে না

অজ্ঞাতবাস

২

সন্দেহ যারা করে না, নীরব, খালি
ধ্যানের সঙ্গে সঙ্গতি খোঁজে ধানে
প্রেয়সী একটা সত্তার দেশোয়ালি
আমরা খুঁজেছি শয্যার মাঝখানে
তবে কেন আজ হতে চাই কাপুরুষ
র‍্যাঁবোর দেশকে ফাঁসিয়ে প্রেমের দায়ে
দরাজ দিলের কাছাকাছি কোনো ফুশ
দুধকে স্বরাজ দেয়নি স্বদেশি চা-এ

শ্বেত আর নীলে কৃষ্ণ ও পীত রাহু
বাড়ায় পুচ্ছ, তুচ্ছতা তায়ো বেশি
উচ্চতা যেন বহু মিলে এক বাহু
এ দীন দেশের বিক্রেতা ভিনদেশি
বেচতে চেয়েছি দেশ আর নীরবতা
সম্ভব আর পরিকল্পিত খাল
খুঁড়তে চেয়েছি, প্রীতি আর তার পতা
জুড়তে চেয়েছি আজ বা আগামীকাল

নাতিদূরে জানি সবাই বেড়াবে আজ
কালকেও যাবে চেনা ফুলটারই কূলে
শব্দে কুড়িটা মৃত শতকের ঝাঁজ
তারা কি মেলাবে সন্ধের গুগ্‌গুলে
কাঁটায় খসাবে কিরণ দু এক কণা
বিরোধী বৃক্ষ পাড়ে থেমে হতবাক
মধ্যবর্তী ছায়াটির আলোচনা
পলাশলোচন পায় যদি তবে পাক

আমাদের ভাষা যেন এক মহাদেশ
ভালোবাসা তার গণ্ডী হয়েছে কিছু
সঙ্গী হয়েছি পরে তার রাজবেশ
সঙ্গ ছেড়েছি যখন নিয়েছি পিছু
পতিত জমিতে গুপ্ত বীজেরা ঘোরে
প্রোথিত শস্য অতীত মরুর কণা

তেলের প্রভাবে চাকাটি ঘুরছে জোরে
ধুলোরা কেবল মানছে না বিনবনা

যুগান্ত ভেবে যখন দুচোখ মেলি
অমোঘ রক্ত রাজপথে শুধু ফোঁটা
মেঘকে পেঁচিয়ে অস্তায়মান চেলি
গোলাপকে বাঁধে হঠাৎ ঠুনকো বোঁটা
হাতুড়ে রক্তে নেই পরিক্ষে-রোগ
অথচ আমূল পরিবর্তনে আশা
বর্তমানে যা ভবিতব্যের ভোগ
মধ্যে মাত্র একবার যাওয়া আসা

৩

জেনেছি এমন শত্রু কখনো আসবে না
মেনেছি এমন শত্রু কখনো বাসবে না
তার বা আমার কোনো ভালমন্দ
কেবল তফাৎ তার চোখ আছে, আমি অন্ধ
এই গাঢ় অন্ধকারে কে কার নীরব ভাষা
কে কার গভীর স্তোত্রে নিজের উপাস্য
দেবতাকে আত্মার দোসর অবতার
বানিয়েছে তা জানি না, তবু তার
দুটি হাত ধরেছি অবশ্য
এ-টা বুঝি আমারই নিজস্ব শস্য
প্রান্তরে ফেলেছি যতো
দেড়া তার তুলেছি অন্তত

স্বপ্নে ডুবিনি, গিয়েছি রসের জৌটিতে
নৌকো যেখানে ভাদুরে রুইএর পেটিতে
ঝলমল করে শুধু হাত তিন গভীরে
আমরা যাই নি আর যাবোও না লোভী রে
অন্য কোথাও

কিন্তু এই বিক্ষত শহরে
কে কবে ফুলের আভা মাখে চোখ ভরে

অজ্ঞাতবাস

নিরঙ্কুশ বিছানায় শুয়ে ছোট্টো দ্বিধা
চেনে কবে নিস্তব্ধতার নতুন অভিধা
উড়ে খোট্টা মেড়ো বা ভাটিয়া
সবাই দিনান্তে শুধু ঘাটাচ্ছে খাটিয়া
এবং পেঁচোয় পাওয়া
ইত্যবসরের ক্ষীণ অবাড়ন্ত হাওয়া
হঠাৎ দমকে বয়ে গুটিয়েছে নগ্ন শাড়িটাকে
দড়ির উপরে আর টাকে
অসংলগ্ন চুল

যতো অনর্থ বাধিয়েছে ওই সে-টি
মূঢ় বাপ বা সে-বাপের বিমূঢ় বেটি
ক্ষণকাল পরে গজানো ঘুঘুর ডানা
গোটা পৃথিবীকে চিনে এসে আধখানা
বিঁধেছে মানুষ আর তার পরিবেশ
দেশ আর তার মৃত্যুর নির্দেশ

৪
আমি তো ভাবি নি এর চেনা কেউ পাবো
যেইমাত্র সন্ধ্যেবেলা প্রদীপে উজিয়ে
খুঁকতে যাবো
সারবান বইটি খুঁজিয়ে

চেয়ে দেখি চেনা সকলেই এই রাজ্যে
আমি আর যা
জানিনা সেটাই অন্তরে গিয়ে বাজছে
তবু তাই দিয়ে লিখবো তোমার আর্যা

তোমার আশ্বাস পেয়ে বেঁচেছি সকলে
রোদে ঝড়ে করুণার নিষ্প্রাণ ধকলে
বেঁচেছি সকলে জেনে নীরবতা, নিষ্কম্প প্রভাত
রাত্রির দ্বারের কাছে উজ্জ্বল দুধের দাঁত
ঘসে পড়ে আছি

দৃশ্যে সবাই নোঙরের ছেঁড়া কাছি

মুক্ত জলের স্মৃতি

১
রাধাবর্ণ দিনকে ঢাকে কৃষ্ণবর্ণ ধুলো
মৃত্তি থেকে চর্মচক্ষু টেনে নামাই ঘাসের মুখে
প্রস্তরিত ক্ষয়ের মধ্যে লুকিয়ে নিই থাবা
একটা যেন ব্যথার মতো থেকেই গেলো, বুকে
থাবাটা তার প্রতীক যেন
রাতের কুঞ্জে ছড়াই দিনের পুঞ্জ তারাগুলো
বিবেক যেন ছড়িয়ে যায় বাক্য-সরোবরে
অর্থ নিয়ে কানাকানি, ধ্বনি মত্ত ঘরে
সন্ধি-আলো নিরতিশয় খরস্রোতা
চিহ্ন খুঁজে উন্মাদিনী, কই সে পূর্বে শ্রোতা
পশ্চাতে কই স্বল্প আভার বধির চিত্র
—যাকে ঘিরে পত্রাবরণ শঙ্খ শালুক নীলা
শিশিরকুঞ্জে ছায়াকায়ার নিরপেক্ষ লীলা
দেখেও ব্যথা ভুলতে বড়ো সময় লাগে (কী বিচিত্র)

২
পূর্বার্ধের গঙ্গা ওরে পশ্চার্ধের যমুনা রে
কুয়াশা আর হারাস না রে দৃপ্ত আলোর ছলনাতে
হাতে রাখিস মৃত্যু গভীর
স্মৃতি-স্বর্গের ধ্রুবতারা
আত্মা যেন ডুবতে পারে ঘাট পেরিয়ে ঘটনাতে
আত্মঘাতী নীরব কবির
বাড়ে যেন হৃদয়-চারা
কর্মনাশার স্রোতে স্রোতে মর্মনাশার পারে
জানি ফুলে তিনটি দিন
জাগবে উষায় উপমিত
তুলিটানা দিগন্বরে গম্ভীরতার রেখা

অজ্ঞাতবাস

ভুলতে পারি এ-কৌপীন
অঙ্গে ধূলো অসম্বৃত
পরাজয়ের ঘোড়ায় চড়ে দিগ্বিজয় শেখা

৩

করবী ফুল চ্যুত হয়ে পড়লো অন্য শাখায়
দুয়ের মধ্যে তুলনা নেই কারণ যেটা নিস্তাপিত
তার দু কূলে একই স্বপ্ন, মৃত লোকের হস্তরেখায়
জীবনরেখা এড়িয়ে গোছ হৃদয়রেখায় অবিন্যিত
সলোমনের অঙ্গুরীয়ে প্রয়োগক্ষম তমো
ডেকে বলছি ওহে সুজন বস্তু ছিলে এখন ভ্রম
জলের মধ্যে বিম্ব ছিলে, বিম্বে জলধর
শুভ্র বর্ণে সমাহিত সপ্তপর্ণী গুহার ভিতর
আমরা তখন ঘুমে তখন বিশাল রাত্রি
ঘরের শব্দে মিত্র কিন্তু প্রেমদাত্রী
নদীরা খায় নিজের কোলের সন্তানের চরু
বাল্য স্বপ্ন ছিনিয়ে নিতে গিয়ে কিন্তু জ্বালা
তীব্র হয়ে জুড়িয়ে যায়, মুড়িয়ে খায় তৃষ্ণা মরু
করবী ওই বিশ্বদহন সোনার থালা

৪

আজ অকুণ্ঠ হৃদয় যেন অন্ধকারের দাস
চেতনা তাই সেই মুমূর্ষু মাছিটির উচ্ছ্বাস
পৃথিবী এক নীলবর্ণ প্রস্তরের ডালে
নীরব পাখির অভুক্ত ফল, পবিত্র কঙ্কালে
অসংখ্যবার মৃতরা দেয় মাংস এবং ঢঙ
আমাদের এই জন্ম তবু নিরাভরণ রঙ
সৌন্দর্যের তীরের ফলায় ফুলের কুঁড়িগুলো
পণ্ডর চোখের অর্থে বেঁধা, হতবুদ্ধি ডিমে
ভবিতব্যের তা দেয় না কর্তব্যের ধুলো
শিশুর কান্না ছিনিমিনি সময়ছন্দে ঢিমে
ভোরের রক্তে পূর্ণতর রোদ্দুরের হৃদে
গ্রামীণ প্রজাপতি আসে হিমের প্রতিপদে
তুলোর বাসা নদীর ধারে পাশে বিষণ্ণতা

কার্পাসেরা নতুন করে হবে না পশারী
সাপের ছোবল এড়িয়ে যাবার উদাহরণ যথা
নিজের সাপের মধ্যে করছি জড়িত পায়চারি

৫

ইদানীং এই দগ্ধ দেশের হৃৎপিণ্ডে মূক আয়োজন
পিপাসু মুখ থুবড়ে আছে এবং যারা স্বজন
তারাও এখন শোকমগ্ন
আর কিছু দিন ধুলো কাদা মেখে চিনুক ভোরের লগ্ন
ঝরার আগের সহজ ক্ষণিক ঝরার পরে অসীম বিঘ্ন
কৃতার্থতার সংজ্ঞা এবার ঃ তোমার কাছে তুমিই আপন
পিতা-পুত্র-স্ত্রী-পতি সব দিবস-রাত্রি-প্রবাস-যাপন
সুখেষু বিগতস্পৃহ দুঃখেষু অনুদ্বিগ্ন
তবু তোমার ক্রয়-ক্ষমতা খাদ্য বিলাস শোকে
এবং যেটা জীবন দেখো জুয়োয় রেসে মদে
ছায়া-অঙ্কে সে-সব দৃশ্য ভেদাভেদের পালা
অর্থে নয় বা সামর্থ্যে নয় অস্মদে যুস্মদে
সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব আজ বাক্য-ব্যঞ্জনার
আমরা শুধু ধূলিধূসর দেশের গুরুভার
বিষাদ, বিনাসূত্রে গাঁথবো আঁসু-ফাসুর মালা

প্রব্রজ্যা

১

পাহাড়ের এ-ধারটা ঢালু। এই পর্বপ্রান্তে অরণ্যমালা উত্তর অংশের মতো তেমন আন্দোলিত হয় না, আর চন্দন ও মলয় সুবাস এখানে বারোমাস রক্ষিত। পাহাড়ের এই ঢালু উপত্যকায় একটা ঝরনা বেশ চওড়া হয়ে নেমে এসেছে নাচের মুদ্রা পালটাতে পালটাতে। অন্যান্য এই সরিৎস্রোতে দু একটা বুনো ফুল নির্ভয়ে পাড়ি দিয়ে যায় দেখে আমি, আমি এক পরিব্রাজক, ভুলতে বসেছিলাম অন্যত্র আমার স্বদেশ, আর স্বজন-ভরা সেই সংসারে প্রায় সবাই রাত্রিকে দীপাধার ভেবে ভুল করে।

'কুরচি আর কুরুবক এখানে অজস্র, আর অজস্র নানা বর্ণের নুড়ি। মাঝে মাঝে সরু পথ পশুদের পশ্চাদ্ধাবন করে আরো গভীর অরণ্যে মিলিয়ে গেছে। 'ওগো গম্ভীর ধ্যানজগৎ, তোমার সম্মোহিত দারুমূর্তি, তোমার বিশাল পাথরের পাখা যা যুগপৎ স্বর্গ ও পৃথিবীকে ছু'য়ে আছে, আর এই আত্তস্বশীর্ষ বাতাস সব মিলে একটি গূঢ়তার আয়োজন করেছে।' স্বদেশ ছেড়ে এখানে আছি তবু এ কি নির্বাসন?

সাত দিন আগে একবার পাহাড়টায় চড়তে গিয়েছিলাম। খানিক ঢালু যাওয়ার পর বড়ো খাড়াই; গায়ের বুনো ঝোপে ভর দিয়ে কোনো রকমে উঠছিলাম। এদিকে আমার বাঁ পাশ দিয়ে ঝরনাটা তড়াক করে লাফ দিয়ে ছুটে গেলো। আমি আশ্চর্য হলাম এও আমার সঙ্গী হতে চায় না। ধারণা হলো, সঙ্গী একটা নির্বাচনের ব্যাপার, সে বহুর মধ্যে একতম, কয়েকজনের মধ্যে অন্যতম নয়। চুড়োটা বেশ ক-হাত চওড়া, আর পা দাপালে বোঝা যায় ভিতরটা ফাঁপা; রোমাঞ্চক অভিযানের নায়ক হলে আমি তখনই সন্ধান চালাতাম। ওইখানে পাহাড়টার হৃদয় ছিলো হয়তো। আহা আজও যদি পাখা থাকতো ওর! পুরাণের দুটো ঘটনার আমি বিরোধী—১) পাহাড়ের পক্ষচ্ছেদন, আর—২) স্বর্গের সিঁড়ি তৈরির আগেই রাবণবধ।

২

আমার হাতে কোনো পতাকা ছিলো না আর আমি জরিপ বিভাগের লোকও নই। মোটা উপন্যাসের নায়কের মতো আমি কেবল ঘটনা ঘটাবার জন্যে আছি

এবং ঘটনা শুধু নায়িকা—কাঠির মতো সরু, তালের মতো ধিঙ্গি, বেঁটে ধুমসি সুশ্রী কুশ্রী হরেক রকম। আজ চেনা পারকে পিছন করে তাকালাম পশ্চিমে। বিশাল অরণ্য ওখানে নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের মতো ঘনশ্যাম। দেখে মনে হলো সুস্থতেদের নাটমঞ্চ হবার উপযুক্ত জায়গা। তার ওপারে কোনো মহাসুন্দরী—যাঁর কপালে এক বিরাট সিঁদুরের টিপ—অন্তর্ধান করলেন অরণ্যমঞ্চের নেপথ্যে মৌনে। কোন কঞ্চুকী তাঁকে চালনা করছে? রাজকীয় ওই অরণ্য শ্রীবৎসা রাজার মতো আড়ালে আড়ালে অসংখ্য সোনার ইঁট রচনা করে চলেছে।

আকাশকে এতে নিবিড়ভাবে আগে কখনো আস্বাদ করি নি
হে আকাশ এবং রাত্রির আকাশ।
'ওগো রাত্রি, সম্ভাবনার করতলের অন্য পিঠ,
আলোই বর্ণনা, তুমি বর্ণের অভাব
ওগো বরবর্ণিনী তুমি অবর্ণনীয়া
গর্জনবিমর্দীর বিরুদ্ধ তুমি মহিষমর্দিণী অন্ধকার
তোমার নিঃশব্দ সুর (কারণ বর্ণই শব্দ)
নক্ষত্রের স্পন্দিত আলোর মধ্যে পুঞ্জীভূত
আর সূর্যের রেখা বেয়ে সেই সুর শব্দ হয়ে ফিরে আসে
যখন তুমি অন্তর্হিত হও।'

'হে আকাশ, তুমি কোটিশ্লোকাত্মক মহাকাব্য, যার সবটাই নীতিবর্জিত রসসম্ভার বাইরেও নারকেলের মালার আবরণ নেই, ভিতরেও সুপুরির শাঁসের কাঠিন্য নেই। নীতিই পুনর্জন্ম এবং নির্বাণ সম্পর্কে ভীতি, তাই ওই বিচি খোলা আঁশ তুলো মিষ্টত্ব কটুত্ব অম্লত্ব এবং পরিশেষে কাঁটা। যা একান্ত পার্থিব তা নাগালকেও হাতের মধ্যে আসতে বাধা দেয়, কিন্তু হে অপার্থিব আকাশ, তোমার দিকে যতো দূর খুশি আমরা হাত বাড়াই, ব্যর্থ হয়েও ভাবি কটি যাতাই বা অমোঘ?
গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন তোমাকে ভস্মাভূত করে না, শীতরাত্রির কুয়াশাও তোমাকে ম্লান করে না, তুমি দিনের কর্মশালা তুমি রাত্রির জপমালা—এই জেনে তোমাকে যারা উপাসনা করে আমি তাদেরই একজন।'

'ওগো তারাবলী, তোমাদের কটি ঘিরে সুষুপ্তির স্বর্ণরেখা
স্বপ্ন সুষুপ্তি ও জাগরণের ত্রিবলি রেখার উপরে
তোমাদের পরস্পরের মধ্যে আমরা নিত্যসম্বন্ধ দেখি না বলে
আমরা একদেশদর্শী
ওগো তারাবলী, তোমাদের মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে
আত্মনিগ্রহের মাদক রস, আমাদের শুভবুদ্ধি তাতে গেঁজে উঠছে কর্তব্যের

সঙ্কীর্ণ পাত্রে
কিন্তু তোমরা একদিন চন্দ্রকলার চতুর্দিক দিয়ে
আনন্দকে বিকীর্ণ করেছো লোকশিক্ষক
মহাকাব্যের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের মতো।'

৩

'মহাকাল তুমিই নিয়তি, নিয়তি স্ত্রীলোক, অতএব তুমি মহাকালী তোমার
নাকে বেশর অভাবে নথ, কানে কানবালা অভাবে মাকড়ি, গলায় বিছেহার, বাহুতে
বাজুবন্ধ এবং আরো সব সেকেলে গয়না
হে মহাকালী, একেলে মেয়েদের মতো কখনো কখনো তোমার গলায় সরু গোটহার
আর হাতে দুগাছা সরু চুড়ি
প্রাচীন বিধবাদের মতো কদমছাঁট দেওয়া তোমার ঘাড়ে কাঁচা চুলের খনিতে পাকা
চুলের ডগাগুলো অভ্রের গুঁড়োর মতো চিক চিক করছে
তোমার সামনে এই যে আমাদের অর্ধনমিত পতাকার মতো করতল বিস্তৃত, এখানে
একটি রেখার বহু অর্থের মধ্যে একমাত্র সম্ভাবনা কোনটি সেইটি
শুধু আমাদের জানতে দাও
এ-ও হতে পারে ও-ও হতে পারে এই দুই সন্দেহের মধ্যে
যে কোনো একটিতে ইতস্তত করা যেমন কঠিন
তেমনি কঠিন এ-ও হবে না ও-ও হবে না এই দুই নিষেধের মধ্যে
একটিতে নিশ্চিত হওয়া
তবু হে মহাকালী,
আমরা যে ক্ষণস্থায়ী এ সম্পর্কে তুমি একটি শাশ্বত ঘোষণা।'

৪.

'অঙ্কুরের মধ্যে দগ্ধ এই জগৎ : আর আমি, আমি এই পবিত্র অগ্নিকল্পকালের
উপরে নতুন করে আমার বাগান সাজাবো। তোমার ধারায় স্নান করার পরে এই
সঙ্কল্পই আমাকে নিরন্তর খুঁচিয়ে মারছে। ব্যথার উপরে প্রলেপ মাত্রেই অতিরিক্ত
ভার। বরং ব্যথাতেই যাদের ব্যথার উপশম হয়, তাদের কাছে জড়ি বড়ি, হোকিম
দাওয়াই, ডাক্তার কবরেজ একজন প্রগল্‌ভ তৃতীয় পুরুষের মতো উঁচোনো। মল্লিকা,
বেলি, জাতী, যূথী নানারকম ফুলের মধ্যে এক চিরআস্বাদ্য পরিমল যখন পরিকীর্ণ
আলোর জালের তলায় ধুলোয় পরিণত হবে তখনই আমার মাধুকরীর শেষ কণাটি
মুখে পুরে অমর হয়ে যাবো।' ঝঞ্ঝনার কাছে আমার ঈদৃশ সংকল্প ব্যক্ত করলাম।
সে বুঝি ঈষৎ হাসলো, ঈষৎ স্থির হয়ে প্রকাণ্ড এক লাফে তার গর্ভস্থ নুড়িদের
হৃদয় মুচড়ে দিয়ে গেলো। প্রভাতের এই দুর্বল হাতের উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়লো

দুপুরের দাবদাহ। শেয়ালকাঁটার বনের ভিতরে ভিতরে অর্ধোচ্চারিত রোদ্দুরের
ধারে ধারে গুটি মেরে যাচ্ছে একটা খরগোশ। চীনে উপকথায় ও-ই বুঝি চাঁদের
থলে অমৃত বসিয়ে মহাকালের নোড়ায় আমাদের মাড়ছে যৌবনের মধু দিয়ে।
সম্ভাবনার কথাটি এখন স্বচ্ছ, আরো স্বচ্ছ করে উচ্চারণ করা দরকার এবং এখনই
পরিপক্ক সময়। অশ্রু আর অট্টহাসির জটাগুলো খুলে খুলে এখানে কতকগুলো
অনাবিল নুড়ি হয়ে পড়ে আছে।

এর গায়ে লাগবার মতো একবিন্দু ধুলোও আর এখানে নেই এবং কালযোজক
অতীব বিস্তীর্ণ বলে মহত্তর কারণসমূহ জানতে পারছি, যেমন জেনেছি দৃশ্য জীবন
আর শবরূপ দৃষ্টান্ত। পাটনাই মটরদানার এক নিরবচ্ছিন্ন ঘটনামালার মধ্যে
স্বচ্ছন্দে বলা যায় এইটে সোজা, এইটে উল্টো, এইটে বাঁকা, এইটে তেড়া, এইটে
গোল, এইটে চ্যাপ্টা কিন্তু এই অষ্টোত্তরশতনামের উদ্দিষ্ট একটাই, সে হলো
আকাঙ্ক্ষা। আকাঙ্ক্ষাই কাছে টানে, আকাঙ্ক্ষাই দূরে ঠেলে। এরই জন্যে বস্তু
বিবেক সমীহা স্পর্ধা দ্বন্দ্ব পাপ পুণ্য শ্রদ্ধতা মালিন্য উপদেশ এবং ছলনা। ঈশ্বর
ভক্তকে যেমন আনন্দে ছলনা করেন, ফল যেমন বুভুক্ষুকে রসে ছলনা করে, তুলো
যেমন হাওয়াকে লঘিমায় ছলনা করে, তেমনি ছলনা দাঁড়িপাল্লার সমান্তরাল
রেখায়। যে দিকটা ঝোঁকে দৃশ্য সেদিকেই।

শোককৃৎস্ন

১

পরিহাস নয়, অন্তর আজ জাগবে
লাগবে শরীরে দুর্নিবারণ জ্বালা
আলাপে গড়াবে রোদের দু-চার পালা,
সদাশয় ছায়া বিকেলের স্মিতহাস্য।

মিত্র অথবা, তোমরা ক্ষণিক শত্রু
আঁচড়ে খামচে আমাকে জাগাও বৃথা
বিশ্বম্ভর আগুন সেও তো চিতা
পরিহাস নয়, অন্তরে জাগ্রত

আমার ব্রতই আমাকে ব্রাত্য করে
উৎকর্ণের বড় দোষ তারা ঠসা
আর যা চিনেছি আমারি অন্ধদশা
কী আলো দেখাবে নশ্বর উর্বশী ?

কশা নেই হাতে, নই কর্কশবাক্
জয়ধ্বজাও চায় শুধু পশ্চাতে
স্বভাবাসিদ্ধ পুরুষ এ-দুই হাতে
পায় না ছাড়াই পারি কি আকাশে উড়তে ?

নতুবা নচেৎ এসব নিষেধমালা
শীতের পরচা ফাটলে বহির্মুখী
আর একবার রসাতলে যদি ঢুকি
তবে যদি চিতা নেভে শেষপর্যন্ত

২

ভাঙতে চায় ভাঙুক ষড়যন্ত্র
রক্ত যাক নড়া দাঁতের স্বপ্নে
চামড়া চুল দম্ভ বেশবাস
আমূল পরিবর্তনের দাস

পায়ের নখে জমুক কড়াধুলো
তর্জনীতে পাকা হলুদ ছাপ
তখন যদি কষ্ট হয়, কষ্ট
চাঁদের মতো এক আধবার নষ্ট

অঙ্গ আছে বলেই জ্বালা নিত্য
অনঙ্গত্ব কেবল জানে রতি
হায় এ কথা শ্রোতার কানে শ্রুতি
অন্য কথা শুধুই অপহ্নুতি

সন্দেহ যা পরিভাষার বাইরে
তলানী পায় তলার কুড়ুনীর যে
গাছকুড়ুনী বোনঝি আছে সে-ই
ছেঁড়া কথায় লাগায় কড়া লেই

চোখ মেলাটা চোখটি বোঁজাবার
মুখবন্ধ, আসল ধাতু মৃৎ
মৃত্যু তবে হতো এমন তীর্থ
মানুষ যদি গিয়ে না আর ফিরতো ?

৩

বড় আকাশ জড়াচ্ছে সব রোদ
ছদ্মমতি স্বভাব ছদ্মবেশী
খর আলোক ভাসায় জনপদ
আপনজন আপন নয় বেশি

কি উচ্ছিষ্ট কি সদ্য সন্দেশ
তৃষ্ণা হলো তটের পরিভাষা
আন্থরতা নদীমাতৃক দেশ
নদী এখন খেলছে স্রোতের পাশা

আমার দৃশ্য বিঁধছে তোমার চুঁচে
নতুন হয়ে ফুটছে রেখাবলী
সোনার ভার জানছে কেবল কুঁচে
সোনার কথা বুনছে ব্রজবোলী

অজ্ঞাতবাস

বিশেষণের পালাটা সংক্ষেপে
মুড়ে রাখছি সংগত কারণে
ছাড়া পেলেই শব্দ উঠবে ফেঁপে
গাল ফোলাবে অভিমানের ব্রণে

ইচ্ছে, তোমার ব্যাজস্তুতি থাক
হতবুদ্ধি স্বয়ং ভর্তৃহরি
অবিশ্বাসের আগেই তো চার্বাক
ঘুণের শাস্ত্রে দিলেন হাতেঘড়ি।

৪.
শুধু নিরাপদ নিরাসক্তির মদ
বিষে অমৃতে ঘুচিটাই যায় আসে
ফল যে তুগেছে তার কাছে কোকনদ
রক্তে ছোপানো বিবেকের ক্ষয়কাশে

কালের চিহ্ন হাতে হাতে ঝরা ডাল
ঘটনা পথিক ফেলে যায় ক্রোশে ক্রোশে
পাতার চিহ্ন আজকে না হবে কাল
কোদালে-কুড়ুলে মেঘছেঁড়া আক্রোশে

নদীসমুদ্র চুষে তাপ ভেজে মাঠে
শস্যের পাপ পরিণতি বাঁজা বীজ
আধানের স্থান জানে যারা ধান কাটে
শহুরে দ্রষ্টা দৃশ্যের চোখে ফ্রিজ

আসক্তিটাই আদি বিবেকের পালা
তবু ছুটে যাওয়া নিরাপত্তার দাগে
ততো বেশি ভাপ লাগেনা গলতে গালা
তবু কজনের চিহ্ন মোহরে লাগে

শেষ রজনী

১.

প্রভু, তোমার পদতলে

আমরা এই সরু পথ দিয়ে বহু ত্যাগ তিতিক্ষা সংগ্রাম তুচ্ছতা এবং অভিষেক-অশ্রু পার হয়ে এসেছি।

আমরা দিনের কণ্ঠায় দাঁড়িয়ে বিগত রাত্রির স্বরভঙ্গে আরো নত আরো দীন আরো সম্বৃত।

আমরা তোমার প্রদত্ত উপহার অরণ্যের ওইপারে ছেড়ে রেখে এলাম। বাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েছি বলে তখন আমাদের আস্থা জন্মেছিলো, কিন্তু সে আস্থা জন্মান্তরের প্রতি অনাস্থা নয়; মনের কলুষ এতো সহজে ধোয়া যায় না যেমন ভোলা যায় না মানুষের স্ত্রী-পুরুষ সংজ্ঞা; সেই সঙ্গে পথের বাধা বিপত্তিকে আমরা খুব আমল না দিলেও পথ দীর্ঘ বলে

ধানক্ষেত শালবন পাহাড়পর্বত ক্ষীণতোয়া ও খরতোয়া নদী সমতল ও বন্ধুর প্রান্তর এ সবই দেখেছি, এবং শুনেছি

পাটলী, শিমলী, জম্বু, দেববন্দিত পরিছদ্রক, কদম্ব, শিরীষ ও কল্পবৃক্ষ এই সপ্তবৃক্ষের মধ্যে একমাত্র জম্বুই সারা দেশে মৈত্রীছায়া করুণাছায়া মুদিতাছায়া এবং উপেক্ষাছায়া বিস্তার করেছিলো বলে এটা জম্বুদ্বীপ; আর অন্যান্য গাছের আগায় বসে মহাকালের পাখি ছয় ছক্কা ছত্রিশটা কঠিন ফল ঠুকরে খায়।

বুঝেছি, অন্তর্নিহিত সব সত্যই 'তৎ' শব্দে নিরঞ্জিত এবং তৎ শব্দের জাল তত্ত্ব, তন্ময়তা ও তদর্থের শোলায় ভর করে জলের উপরে জেগে আছে। অতএব 'তৎ' একটি সূচিমুখ যোজকের নাম (দুটি হৃদয়ের ব্যাকুলতা যেখানে এসে মেলে অথচ পরস্পর প্রবেশ করে না)।

২.

প্রভু, তোমার ওই অপরাহ্নের উত্তরাধিকার যদিও আমাদের সহজলভ্য তবু সেই প্রাজ্ঞকথিত মরীচিকা এবং সুদূর নামক দুরাশায় আমাদের কেউ দগ্ধ করতে পারেনি, আমরা শুধু শৈশবের দুধনদীর এপারে খানিকখন ওপারে খানিকখন অপেক্ষা করেছি। দেখেছি, সব কিছুই দু ভাগে ঢালু হয়ে পরিণতির গর্ভে নেমে যায়—১) ঢেউ শুশুক পলিমাটি এবং ২) প্রতিমা। প্রতিমাও দু রকম—১) অভিধা-প্রতিমা ও ২) লক্ষণাপ্রতিমা। এর মধ্যে প্রথমটি আমাদের সবার থেকে প্রাচীন

এবং দ্বিতীয়টি অভিনব।

প্রভু, তোমাকে অন্তর দিতে পেরেছি বলে আমরা ভক্ত।

প্রভু, তোমার অন্তর নিতে পারি নি বলে এখনো ভক্ত।

প্রভু, তোমার এবং আমাদের অন্তর যখন পরস্পরের ভক্ত হবে তখন কি এই অপরাহ্নের শরীর আমাদের পরিণত বাসনার অশ্রুর মতো আরো নিটোল হবে? আরো নিঃসঙ্গ? আরো মহান? এবং আরো নীরব? কালের কাঁধে দুলছে আলোকলতা। কাল সর্বজয়ী। বৃথাই ইন্দ্রত্বে বড়াই করা। স্বর্ণসিংহাসনের হাতলে চুমকি বসানো প্রবাল, পায়ায় খচিত মুক্তোফল, পিঠে গোমেদ নীলকান্ত-মণি দিয়ে মোড়া স্ফটিক, আসনের মধ্যমলে নিরুকুশ আরাম, পদ্ম খোদাই করা শ্বেত পাথরের পাদপীঠ এবং হাজার সুর-নর-যক্ষ-কিন্নর-বনিতার ভ্রূবিলাসে উত্তাল প্রাসাদ—সমস্তই কালের প্রভাবে পুণ্য ক্ষয়ের মতো মিলিয়ে যাবে, থাকবে কেবল এই গতবৈভব অহং, ধড়াচূড়ো ছাড়া পালাশেষের নায়কের মতো। বর্তমান এতোই সঙ্কীর্ণ যে আমাদের এক পা সর্বদা অতীতের কাঁধের উপরে; পদাহত অতীত আমাদের ক্ষমা করে না আর অতীত আস্ফালন ভাবী উপদেশ হয়ে আমাদেরই কাছে ফিরে আসে।

৩

প্রভু, তোমার ওই আসনের শুভ্রতা ছাড়া (তোমার আসন)

বা

প্রভু, তোমার ওই আসনের শুভ্রতা ছাড়া (তোমার আসন)

আর সবই অসার। তাই সার বুঝেছি, যেখানে মৃগ আছে সেখানে মার্গ নেই, যেখানে আতিশয্য আছে সেখানে নিভৃত শয্যা নেই। বুঝেছি, আমরা এতোদিন দু নৌকোয় পা দিয়েছি বলেই এতো অভিনয় এবং অভিনয়ের মধ্যে সংলাপ তার মধ্যে আবার অভিনয়। অভিনয় কদাচিৎ আমাদের তোমার স্বরূপের দিকে নিয়ে যায় এবং সংলাপ তোমার বাণীর বিরোধী।

আরো বুঝেছি, সমগ্রের মধ্যে আমরা বিন্দু হয়ে ঘুমিয়ে ছিলাম বলে সমগ্রকে চিনি নি, আত্মার মধ্যে শুভ্রতা হয়ে জেগে ছিলাম বলে শুভ্রতা চিনেছি। অন্তরই আমাদের অন্তরায়। সেই সঙ্গে হিরণ্ময় পাত্রকে ধিক্, কারণ ওরই লোভে চতুর্দিকে দিকপাল রাত্রিরা ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

৪

প্রভু, আমাদের আর নবজন্মের জন্যে প্রতীক্ষা করতে বলো না। আমরা এখন ছাতিম গাছের ছায়ার মতো গোল হয়ে নিভে যেতে চাই। ফুৎকারের মুখে প্রদীপ আগলানো পেলব হাত আমরা অনেক দেখেছি—ফুৎকার নিঃসন্দেহে অবিমৃষ্যকারী,

তবু বলবো, ওই সব হাতের পরিধি ততোটা গোল নয় যতোটা হলে নিয়তিকে বারণ বা হাওয়াকে নিবারণ করা যেতো। আমরা তো ভেবেছিলাম হাতগুলো প্রদীপের আরো কাছে আসবে এবং গলে তেল হবে কিম্বা প্রদীপগুলো আরো দূরে সরবে এবং বাতাস হয়ে জ্বলবে। যাই হোক আবার জন্মানো মানেই আবার নিভে যাওয়া—মাটিতে নিভে যাওয়া, কান্নায় নিভে যাওয়া, সুখ-দুঃখে বিচলিত চোখের কুণ্ডনে নিভে যাওয়া, প্রসারণে নিভে যাওয়া। প্রবেশের আগেও কাল ছিলো, প্রস্থানের পরেও কাল থাকবে, অথচ এই বদ্ধ ঘরে যার বৃদ্ধি আছে সেই একদিন বৃদ্ধ হবে। কিন্তু খোলা আকাশের তলায় কাল অপরিণত এবং সে কাল ফুল ফোটার আগের ও ফুল ঝরার পরের কাল। এই দুটিকে পৃথক করে জানার নামই জ্ঞান, সীমিত চংক্রমণের নাম যেমন চক্র।

অতএব

এই শেষ রজনীর পালাশেষে আমাদের

প্রভু, বিশ্রাম দাও এবং বিশ্রাম—তোমাকে স্মরণ করার বিশ্রাম।